বীর মুক্তিযোদ্ধাদের

স্মৃতিতে '৭১

পল্লী
কর্ম-সহায়ক
ফাউন্ডেশন

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের
স্মৃতিতে '৭১

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

উপদেশক

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

প্রফেসর শফি আহমেদ

সম্পাদনা

মোঃ মশিয়ার রহমান

গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস

মোঃ আব্দুল মতিন

আশরাফুল আলম

নাভেদ আল রাজী

মোঃ ইসরাইল হোসেন

শারমিন মৃধা

মোঃ মাসুম কবির

সম্পাদকীয় সমন্বয়কারী

এইচ. এম. শাহারিয়ার

প্রচ্ছদ ও সম্পাদকীয় ডিজাইন

সবুজ চন্দ্র হাওলাদার

প্রকাশক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০২১

ISBN: 978-984-35-1884-2

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে '৭১

মুদ্রণ: ইন্টারলিংক

উৎসর্গ

বহুমুখী প্রতিভায় ভাস্বর, দেশে বিদেশে বর্ণাঢ্য কর্মময়
জীবনের অধিকারী বাংলাদেশ সরকারের এযাবৎ দীর্ঘতম সময়
অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা
স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত সর্বজন শ্রদ্ধেয় অসাধারণ একজন মানুষ
আবুল মাল আবদুল মুহিত
মহোদয়কে গভীর শ্রদ্ধায়।

সূচি

প্রাক্‌কথন	০৬
মুখবন্ধ	১০
বক্তব্য	১২
সম্পাদকীয়	১৫
মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ	১৮
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান	২২
মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননায় পিকেএসএফ	২৪
মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ আয়োজিত আলোচনা সভা	২৬
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন স্মৃতিকথন	৫৬

প্রাক্‌কথন

২০২১ সাল বাংলাদেশের জন্যে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর একই সাথে মুজিব শতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। উৎসবের এ ঐতিহাসিক লগ্নে প্রথমেই গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা-পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখে তাঁর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ২৬৫ দিন মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনা হয়। স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তীতে কৃতজ্ঞচিত্তে আরো স্মরণ করছি শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অধিকার-স্বাধিকার-স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন সময়ে যারা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এবং যারা শহিদ হয়েছেন তাদের সবাইকে। আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সকল জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতের পর ২৭ মার্চ বিকেলে কয়েক ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন রহিত করা হয়। ওই সময়ে আমি সপরিবারে এলিফ্যান্ট রোডের বাসা ছেড়ে ধানমণ্ডিতে এক আত্মীয়ের বাসায় চলে যাই। দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ৭ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন আমি ও কয়েকজন সহকর্মী মিলে অর্থনীতির বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট প্রেরণ করতাম। আমার ধারণা ছিলো সংশ্লিষ্ট পাকিস্তানী কর্মকর্তাগণ এ বিষয়টি জানত। পরে জেনেছি, ২৮ মার্চ সামরিক বাহিনীর লোকজন আমাকে খুঁজতে আমাদের বাসায় এসেছিল। একাত্তরের এপ্রিলের শেষের দিকে অবস্থা স্বাভাবিক দেখানোর অপচেষ্টা চালায় দখলদার বাহিনী। সেই সুযোগে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে লঞ্চে করে বিভিন্ন পথ ঘুরে সিলেট যাই। জকিগঞ্জ থেকে কুশিয়ারা নদী পার হয়ে ভারতের করিমগঞ্জ গিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাব-সেক্টর কমান্ডার তৎকালীন মেজর আব্দুর রব-এর সঙ্গে যোগাযোগ করি। সেখানে কয়েক সপ্তাহ থেকে কলকাতা গিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের

কাছে রিপোর্ট করি। পরে অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও ড. স্বদেশ বোসকে সদস্য করে বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা সেল গঠন করে। আমি এ সেলে উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমি স্বাধীন দেশে ফিরে আসি। উল্লেখ্য, একই ফ্লাইটে তৎকালীন মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ-এর স্ত্রী সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আসেন। এ তো গেল আমার নিজের কথা।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দীর্ঘ শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রাম ও জেল-জুলুমের ইতিহাস, স্বাধীনতাকামী সকল সংগ্রামী নেতা-কর্মীর ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাস; দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, লাখো মুক্তিসেনার বীরত্বের ও ত্যাগের ইতিহাস, স্বজন ও সম্মান হারানো মানুষের ইতিহাস, অজানা আরো অনেক নির্মমতা ও গৌরবের ইতিহাস।

আমি খুব সৌভাগ্যবান যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী প্রত্যক্ষ করছি। শুধু কি তা-ই! একই সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা-পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিব বর্ষ পালন চলছে। জাতি এক অত্যন্ত গৌরবমণ্ডিত সময় পার করছে। যদিও কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের আনন্দ-উৎসবকে অনেকখানি অবদমিত করেছে এবং সব কর্মসূচি যথেষ্ট সীমিত আকারে ও সতর্কতার সঙ্গে পালন করতে হচ্ছে। তবুও আগ্রহ ও উৎসাহের কমতি নেই। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম-আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত হওয়া। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, যা এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বাস্তবায়নাধীন। এর মৌলিক বিষয় হচ্ছে 'কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না', সবাইকেই ন্যায্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাতেই এই দিকনির্দেশনা রয়েছে, রয়েছে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যয়ী মুক্তির সংগ্রামের ঘোষণায়। বাংলাদেশের এ যাবৎ অর্জনগুলোকে সুসংহত করা, অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং এই প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ সব অঙ্গনে সবার ন্যায্য

অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এই আমার প্রত্যাশা।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিনি সকল ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করছেন। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা মাসিক ২০ (বিশ) হাজার টাকায় উন্নীত করেছেন। যে সকল মুক্তিযোদ্ধা নানাভাবে অসুবিধাগ্রস্ত অথবা অসুস্থ,তাদের পাশে দাঁড়ানো সরকারের পাশাপাশি সমাজের সামর্থ্যবান সবারই কর্তব্য। আমি বিগত কয়েক বছর ধরে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে ঘুরছি। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজ-কর্ম দেখছি ও সাধারণ মানুষের চাহিদা ও বাস্তবতা বুঝে সেই অনুসারে কর্মসূচি নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করছি। যেখানেই যাই, সব সময় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে সামর্থ্যবানদের মধ্যে আশানুরূপ আগ্রহ লক্ষ করি নাই। স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে আমাদের মাথা উঁচু করে বাঁচতে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজি রেখে লড়েছেন, তাদের দুঃখ লাঘবে যারা সচেষ্ট হন না তারা নিশ্চয়ই বিবেকহীনতায় আক্রান্ত। পিকেএসএফ থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সাধ্যমত ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কীভাবে আরো সুসংহত ও সম্মানজনক করা যেতে পারে, তা বিবেচনার দাবি রাখে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা এখনো তৈরি করা হয়নি। অনেক ধান্দাবাজ লোক মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় তাদের নাম লিখিয়ে নিয়েছেন। বর্তমান সরকার যাচাই-বাছাই করে একটি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তালিকা প্রণয়ন করার চেষ্টা করছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আমার সভাপতিত্বে সভায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন

সহযোগী সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের ২০২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার অন্যান্য নির্বাহী পরিচালকসহ প্রায় ৩৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় বক্তব্য প্রদানকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন জীবনের কঠিন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করে রাখার প্রয়াসে পিকেএসএফ থেকে প্রথমবারের মত "বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে '৭১" শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত। এটি প্রণয়ণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই।

- ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুক্তিযোদ্ধারাই আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার মহান বীর। নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এ সকল সূর্য সন্তান আমাদেরকে একটি দেশ ও একটি পতাকা উপহার দিয়েছে। যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি তাদেরকেও স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে করতে হয়েছে অনেক ত্যাগ স্বীকার। যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের গর্বিত নাগরিক, তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে আমরা চরম অবহেলা, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছি, যার অনিবার্য পরিণতি ১৯৭১-এ আমাদের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম। এদেশের মানুষ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের অন্যায় যুদ্ধকে মোকাবিলা করেছে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমতা, গণতন্ত্র, সামগ্রিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচনে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এরও অংশীদারিত্ব রয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পিকেএসএফ ১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থিক ও অ-আর্থিক সহায়তা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পিকেএসএফ বিশ্বাস করে মানুষের জীবনযাপন ও দারিদ্র্য বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব-মর্যাদাপূর্ণ জাতি গঠনের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নসহ দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল অনুষঙ্গ নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২০১০ সালের গোড়ার দিকে মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত

উন্নয়নের ধ্যান-ধারণার একটি মৌলিক কাঠামোর রূপরেখা প্রদান করেন। এর ভিত্তিতে পিকেএসএফ তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারসমূহকে লক্ষ্যভুক্ত করে 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা তাদের সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারী হতে পারে।

মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তীতে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। পিকেএসএফ সবসময় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আছে এবং থাকবে। 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৬ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১১ দিন পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

বিগত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন কঠিন সংগ্রামের ইতিহাসগুলো তুলে ধরার লক্ষ্যে 'বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে '৭১' শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আমি সমৃদ্ধি কর্মসূচির এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য ত্যাগের ইতিহাস বর্তমান যুব সমাজকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আরো উদ্বুদ্ধ করবে, এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

- ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

বক্তব্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শিক পথপরিক্রমার সূত্রপাত হয় ১৯৪৭ সালে অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলনের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিকে বেগবান করেছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জগৎ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর দেশকে পাকিস্তানি দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লাখো প্রাণের বিসর্জন, অসংখ্য মা-বোনের আত্মত্যাগ, মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন ও সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলার বীর মুক্তিসেনানীগণ কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কালে ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এ লগ্নে আমার গভীর শ্রদ্ধা তাঁদের প্রতি যাঁরা এই অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও দেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অদম্য মনোবল নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশের পুনর্গঠন কার্যক্রম শুরু করেন। পর্বতসম প্রতিকূলতা যেমনি আমাদের অদম্য সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল দমাতে পারে নাই, তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, বিধ্বস্ত অবকাঠামো ও বৈরী পরিবেশ কোন বাধাই বঙ্গবন্ধুকে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও পরিকল্পনায় মাত্র সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ায় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য

সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়। স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের মাঝপথেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কিছু বিপথগামী সেনা সদস্য কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন। এ দেশ যেন আবার দিশা হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতে শুরু করে। দেশ গভীর সংকটে নিমজ্জিত হতে থাকে। ঠিক তেমনি একটি সময়ে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ পুনর্গঠনের সুযোগ পান। তাঁর নেতৃত্বে দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অবকাঠামো, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিল্পের বিকাশ ও আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জনের মাধ্যমে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে যুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি এবং ২০৩১ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। দীর্ঘ সময় পর দেশবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের বিনিময়ে যে দেশের স্বপ্ন দেখেছিলো ঠিক সে দেশটিই দেখতে পাচ্ছে।

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের পরিকল্পনা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২০০৯ সালে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় ২০১০ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা 'দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া'-কে আরো গভীরভাবে ধারণ করে পিকেএসএফ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পুনর্বিন্যাস করে। প্রতিটি মানুষকে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করে একটি মর্যাদাপূর্ণ জাতি বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে পিকেএসএফ।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বর্তমানে আমরা সেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। আমরা আরো সৌভাগ্যবান যে, একই সাথে আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করছি। এই শুভক্ষণে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আরো কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি ভাষা শহিদ, মুক্তিযুদ্ধে

অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ সর্বস্তরের জনগণকে যারা তাঁদের জীবন বাজি রেখে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করেছেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও উন্নয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা স্মরণ করে সরকারের পাশাপাশি পিকেএসএফও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর মধ্যে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক অনুদান প্রদান, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যকার্ড ও চিকিৎসা প্রদান, সম্মাননাপত্র প্রদান ও মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবরে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহও বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই অংশ হিসেবে বিগত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বক্তব্য, রচিত কবিতা ও স্মৃতিকথা নিয়ে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি ইউনিট 'বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে '৭১ শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। স্মরণিকাটি নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরো গভীরভাবে ধারণ করতে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। স্মরণিকা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

- ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা একটি দেশ তথা জাতির অস্তিত্বের স্বতন্ত্র চেতনায় উদ্ভাসিত এক গর্বের প্রতীক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতির প্রাণের স্পন্দন ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে দেশের আপামর জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সজ্জিত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অসীম সাহসী নিরীহ ও নিরস্ত্র মুক্তিকামী বাঙালিদের প্রাণপণ লড়াই, অপরিসীম ত্যাগ ও লাখো জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে স্বাধীনতার সোনালি সূর্যকে ছিনিয়ে আনার ইতিহাস বিশ্বের কাছে আজও এক বড় বিস্ময়। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বাংলাদেশের গর্ব। তাঁরা দেশের সূর্য সন্তান। স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চির সম্মানের আসনে আসীন করেছেন। আমরা এ বছর যুগপৎ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করছি। এই শুভলগ্নে আমি শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অধিকার-স্বাধিকার-স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন সময়ে যারা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, শহিদ হয়েছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। সালাম জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরও।

অর্থনৈতিক বঞ্চনামুক্ত ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠা সরকারের কল্যাণমুখী নানা উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পিকেএসএফ বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উপযুক্ত অর্থায়ন, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিস্তার, বাজার সংযোগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং টেকসহিতার জন্য যথাযথ পরামর্শ সেবা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের

মাধ্যমে দেশের এক কোটিরও অধিক পরিবারকে সম্পৃক্ত করে এ সকল কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর সার্বিক দিকনির্দেশনা স্বাধীনতায় সংগ্রামের মূল চেতনার সাথে পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকাণ্ডকে আরো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস বেগবান করেছে। মানুষের সার্বিক মুক্তি ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সমৃদ্ধি-শীর্ষক একটি মানবকেন্দ্রিক কর্মসূচি চালু করার মাধ্যমে অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের মুক্তি সংগ্রামের একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে পিকেএসএফ তাঁদেরকে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করেছে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহায়তার জন্য পিকেএসএফ থেকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবরের স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯-এর কারণে আমরা একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। বিগত মার্চ ২০২০ থেকে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা রক্ষায় নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের কারণে বয়স্ক ব্যক্তিদের ওপর শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক প্রভাব বেশি পড়ছে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সকলেই প্রবীণ ব্যক্তি, ফলে তাদেরকেও কোভিড-১৯ এর প্রভাব বেশি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। পিকেএসএফ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ ব্যক্তি এবং বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সহজভাবে পরিচালনার জন্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদানের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অনলাইনে টিকা নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণে সহায়তা প্রদান, আর্থিক সহায়তার জন্য পরিপোষক ভাতা প্রদান ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে মানসিক সহায়তা প্রদান করছে।

পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে

বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখ দেশের ৬৪টি জেলার বিভিন্ন উপজেলার সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত এলাকার ২০২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও পর্ষদ সভাপতিদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য, রচিত কবিতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ইত্যাদি নিয়ে 'বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে '৭১' নামে প্রকাশিত এ স্মরণিকাটি পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকাণ্ডসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি আরো বেশি উজ্জীবিত করবে। পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকাণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের ভূমিকা আরো জোরালো হোক এবং পিকেএসএফ-এর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে বঞ্চনামুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে যার যার অবস্থান থেকে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে ব্রতী হোন, এটাই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ

পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনা এবং পরাধীনতার নাগপাশ হতে জাতিকে মুক্তির লক্ষ্যে দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন। তিনি রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উক্ত ঘোষণার মাধ্যমে এই ভূখণ্ডে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বীর বাঙালি মাতৃভূমিকে হানাদারমুক্ত করতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রশিক্ষণবিহীন নিরস্ত্র বাঙালিরা যেভাবে একটি সুশৃঙ্খল অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে সংগ্রামের এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত মহান বিজয়। মুক্তিযুদ্ধ মানে বঞ্চনার পরিসমাপ্তি, শোষণের চির অবসান। একটি আত্মনির্ভরশীল এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে সংঘটিত হয়েছিলো আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে ও সংবিধানে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি ছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য। জাতির পিতা শেখ মুজিব সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। দেশ আবারও দিশা হারিয়ে ফেলে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে দেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০২১', 'রূপকল্প ২০৪১' এবং শতবর্ষ মেয়াদি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণ করেছেন। জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে

দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার পাশাপাশি উন্নয়নকে স্থায়ী রূপদানই এসব মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আজ নানা মাত্রায় এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের কাছে উন্নয়নের 'রোল মডেল'। ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ-এরও অংশীদারিত্ব রয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সব অঙ্গীকার আমরা আজও অর্জন করতে পারিনি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেদিনই পুরোপুরি বাস্তবায়ন হবে যেদিন এদেশের প্রতিটি মানুষ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের অবারিত সুযোগ পাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' প্রতিষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রাথমিকভাবে পিকেএসএফ শুধুমাত্র গ্রামীণ কৃষি ও অকৃষিজ খাতে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ে কাজ শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রকার বাস্তবভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসইভাবে দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা, প্রযুক্তি, সংস্কৃ-
-তি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ইত্যাদি মানব দারিদ্র্যের নানান অনুষঙ্গ নিয়ে পিকেএসএফ কাজ করছে।

বর্তমানে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। পিকেএসএফ প্রদত্ত সেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন সেবা, কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা, ব্যবসা গুচ্ছভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, বাজার সংযোগ স্থাপন, মানব সক্ষমতার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা, পরিবেশের অবক্ষয় রোধ, উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা

ইত্যাদি। সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে নারী উন্নয়নের ওপর। প্রতিষ্ঠার পর হতে পিকেএসএফ এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাদেরকে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল সহায়তা দিয়েছে; সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সর্বমোট ৩.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ সদস্যদের মাঝে বিতরণ করেছে। আর্থিক ও কারিগরি সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ রয়েছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তাদের পরিবার। উদ্যোক্তাগণ পিকেএসএফ-এর কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগের আধুনিকায়ন করার সুযোগ পাচ্ছে। এতে দেশের কৃষিখাত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ব্যবসা এবং সেবাখাত-এর প্রসার ঘটছে।

পিকেএসএফ অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকার ঘোষিত দেশের ১৬টি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এ সকল কর্মসূচিতে দেশের বিচ্ছিন্ন এলাকা, চরাঞ্চল ও দুর্গম জনপদের অবহেলিত অধিবাসী; দলিত সম্প্রদায়, নৃ-গোষ্ঠী, বেদে, চা-শ্রমিক, প্রতিবন্ধী পরিবারসহ বিভিন্ন দুর্গত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করেছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্যেও পিকেএসএফ কাজ করে যাচ্ছে। প্রবীণদের বয়স্ক ভাতা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। গ্রামীণ জনপদে প্রবীণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রবীণদের বিনোদনের ব্যবস্থা করে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নেও কাজ করেছে।

সরকারের প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ "কাউকে পিছনে ফেলে নয় (No one will be left behind)" নীতি অনুসরণ করছে। পিকেএসএফ-এর লক্ষ্য পিছিয়েপড়া, পিছিয়েথাকা ও পিছিয়েরাখা মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও তাঁদের মানব মর্যাদা নিশ্চিত করা। দারিদ্র্য বহুমাত্রিক। পিকেএসএফ দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার বিষয়টিকে ধারণ করে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারকে লক্ষ্য করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'সমৃদ্ধি' নামে একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো, সমাজের প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করে সকলের মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা। সে জন্য বয়স নির্বিশেষে সমাজের সকল জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের জন্য উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি ২০১০

সাল থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয়ে বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ১৬৬টি উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২টি ইউনিয়নের প্রায় ১২.৬২ লক্ষ খানায় ৫৭.৮৫ লক্ষ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের সুস্থ, স্বাভাবিক ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য যে ধরনের আর্থিক বা অ-আর্থিক সেবা প্রয়োজন, তার সবই কোন না কোনোভাবে তাদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য 'শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, দুর্নীতি ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া'। সেই লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ তার সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে সদা নিবেদিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান

হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালির শ্রেষ্ঠতম এবং অদ্বিতীয় অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে যার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু মানেই এদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশ ছাড়া যেমন বঙ্গবন্ধুকে কল্পনা করা যায় না ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশকে ভাবা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় মুক্তির সংগ্রামের কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ও স্বাধীন বাংলাদেশের কথা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে ১৯৭১ সালে উদিত হয়েছিলো বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সূর্য, বাঙালি জাতি পেয়েছিলো বাঁচার নতুন আশা। বীর মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, আর শেখ মুজিবুর রহমান হলেন শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নামের মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিলো বলেই আজ আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক, তাঁর জন্ম হয়েছিলো বলেই আজ আমরা নিজস্ব দেশ-ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করতে পারছি। অর্ধ-শতকের পথচলায় অর্থনৈতিক মুক্তির যে সোনালী দিগন্তের সামনে বাংলাদেশ আজ দাঁড়িয়ে, তারও অনুপ্রেরণা তিনি।

একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখে দেশ স্বাধীন করেছিলেন এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা, যার ফলে বাংলাদেশ পেয়েছিলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও লাল-সবুজের একটি পতাকা। বাংলাদেশ সরকার এবং রাষ্ট্রের সকল স্তরের জনগণ সব সময় মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে আসছে এবং তাঁদের কল্যাণে সদা সচেষ্ট। জাতির জন্যে সাগরসম গভীর ভালোবাসা এবং বিশাল মমত্ব সম্পন্ন সন্তানদের অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে

তাঁদেরকে বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ৬৭৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ৪টি ক্যাটাগরিতে (বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক) বিশেষ সম্মাননাসূচক খেতাব প্রদান করে। জাতির শ্রেষ্ঠ বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা ও সম্মাননা জানাতেই বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালে প্রথমবার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাসিক ভাতা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীকালে সচ্ছল ও অসচ্ছল সকল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার ২০২১-২২ অর্থবছর হতে মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্বের মাসিক ভাতা ১২,০০০ টাকার স্থলে ২০,০০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানানো ও তাঁদের বীরত্বপূর্ণ কাজের অবদানের জন্য স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োগে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। সরকার যুদ্ধাহত, অসচ্ছল ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের 'বীর নিবাস' নামক আবাসনের ব্যবস্থা করছে। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং তাঁদের সম্মান জানানোর জন্য প্রতিবছর জাতীয় বিশেষ বিশেষ দিবসগুলোতে দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে তাঁদেরকে বিনামূল্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্ভ্রম হারা হয় প্রায় তিন লাখ নারী। তাঁরাও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী। তাঁদের ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে করেছে আরো মহান। ২০২০ সালের ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার ঘোষিত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪০০ জন। এছাড়াও মহান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী ব্যক্তিদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে বর্তমান সরকার ২০১১ সালে ০৩টি ক্যাটাগরিতে বিশেষ সম্মাননা (বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা ও বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা) চালু করে, যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩২৮ জন ব্যক্তি ও ১০টি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান আমাদের গৌরবের ইতিহাসকে আরো বর্ণাঢ্য করেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননায় পিকেএসএফ

বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) জন্মলগ্ন হতেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আসছে। পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২০২টি ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে সমৃদ্ধির স্বাস্থ্যকার্ড ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করে আসছে। পঞ্চগড় জেলার ভজনপুর ইউনিয়নের ২৫ জন, ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলাধীন বাচোর ইউনিয়নের ০৫ জন, বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলাধীন ছাতিয়ানগ্রাম ইউনিয়নের ০২ জন ও নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন বোয়ালিয়া ইউনিয়নের ০২ জনকে অর্থাৎ মোট ৩৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতিজনকে ১ লক্ষ টাকা হিসেবে ৩৪ লক্ষ টাকা এবং গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার ১০ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে ৫০,০০০ টাকা করে মোট ৫ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪৪ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে ৩৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে তাদের পরিবারের আর্থিক দৈন্যদশা থেকে মুক্ত হয়ে সম্মানজনক জীবনযাপন করছেন। পিকেএসএফ-এর সভাপতি কর্তৃক সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নে বসবাসরত ২,৬৫২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে পত্র প্রেরণ করা হয়। তাঁদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া, তাঁদেরকে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের বিভিন্ন সামাজিক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সম্মানিত করা হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সারাদেশে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ ১৬ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১১ দিন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে যৌথভাবে

বিভিন্ন সভা-সেমিনার, সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের যুবদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সন্তানদের নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমি যা জানি' শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতা, পিকেএসএফ ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, দোয়া মাহফিল, এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ, পিকেএসএফ ভবনে পতাকা উত্তোলন ও আলোকসজ্জা প্রভৃতির আয়োজন করেছে। উক্ত ১১ দিনব্যাপী কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বিগত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এমন ১২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এমন ১০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের ২০১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণসহ প্রায় ৩৫০জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে পিকেএসএফ তৃণমূল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার সুযোগ পেয়েছে। ভার্চুয়াল সভার অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

উক্ত ওয়েবিনারটি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পিকেএসএফ-এর একটি মিলনমেলা ছিলো। যদিও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানটি সরাসরি আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। সভায় অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধার কথা শোনা সম্ভব হয়নি। তাই যে সকল মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা শোনার সুযোগ হয়নি তাঁদেরসহ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বলিত লেখা নিয়ে এই সংকলন প্রকাশ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদান লিখিতভাবে পিকেএসএফ-কে জানানোর জন্যে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ আয়োজিত আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ১২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ১০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের ২০১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণসহ প্রায় ৩৫০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের যুদ্ধকালীন দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন।

সূচনা বক্তব্য

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই ভার্চুয়াল সভার উদ্দেশ্য ও সভায় অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ ১৬ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১১ দিনব্যাপী সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন সভা- সেমিনার, সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের যুবদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা

(গল্প-প্রবন্ধ, কবিতা লেখা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা), পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সন্তানদের নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমি যা জানি' শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতা, পিকেএসএফ-এ অবস্থিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, দোয়া মাহফিল, এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ, পিকেএসএফ ভবনে পতাকা উত্তোলন ও আলোকসজ্জা প্রভৃতির আয়োজন করেছে। পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান মহোদয়কে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা এমন একজন অভিভাবক হিসেবে পেয়েছি যিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। যাঁর নির্দেশনায় আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এমন একজন অভিভাবক পেয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত। বঙ্গবন্ধু যে শোষণহীন এবং সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

স্বাগত বক্তব্য

জনাব মোঃ ফজলুল কাদের

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের একই সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করার বিষয়টিকে একটি বিশেষ সুযোগ ও গৌরবের বলে অভিহিত করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সভার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশেষ করে এই সভায় অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এমন ১২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ১০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের ২০১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের অনন্য নেতৃত্বের

বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুক্তি সংগ্রামে রূপান্তরের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক ও মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে এদেশের মানুষকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছেন এবং এদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছেন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাগুলো নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ আমাদের পিকেএসএফ-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চেতনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছেন এবং 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মতো একটি মানবকেন্দ্রিক কর্মসূচি চালু করেছেন। তিনি আমাদের সকল কর্মসূচিকে এসডিজি তথা টেকসই উন্নয়নের অভীষ্টের সাথে মিল রেখে প্রণয়ন করেছেন, পিছিয়ে পড়া মানুষদের মুক্তি সংগ্রামের একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর সহযাত্রী করে নিয়েছেন। সে অর্থে আমি মনে করি, আমরা পিকেএসএফ-এর সবাই মুক্তির সেনানী। সরাসরি মাঠে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ না পেলেও মুক্তি সংগ্রামের অভিযাত্রায় শামিল হওয়ার সুযোগ আমাদের রয়েছে।'

বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর চিন্তা ও চেতনাকে ধারণ করে নিজ নিজ জায়গা থেকে এই মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সংস্থার নামঃ গ্রামাউস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ ফুলপুর, ময়মনসিংহ

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাকিম সরদার

সভায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে জনাব হাকিম সরদার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য এবং পাকিস্তানের শোষণের করাল গ্রাস থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবনের অর্ধেক সময় কারাবরণ করেছেন। তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ফলেই আমরা তাঁর ডাকে

সাড়া দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের সময় আমি রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে।

পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ স্যারের উদ্ভাবিত 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি' আমাদের ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, আমার নিজের ইউনিয়ন ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন ফুলপুর ইউনিয়নকে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র অন্তর্ভুক্ত করায় ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ স্যারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)'-এর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এর উপদেষ্টা হিসেবে আমি জড়িত আছি। এই ইউনিয়নে তিন জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বর্তমানে আমরা দুই জন মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছি। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ফুলপুর ইউনিয়নে ল্যাট্রিন বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় চোখের ছানি অপারেশন, ১০ জন ভিক্ষুক পুনর্বাসন, প্রবীণদের ভাতা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান, কম্বল, ছাতা, হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে এবং যুবদের সংগঠিত করে বাল্যবিবাহ রোধ, মাদক বিরোধী সমাবেশ ও খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া ইউনিয়নে কেউ কোন সমস্যায় পড়লে সংস্থা কর্তৃক তা যাচাই করে আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে ।

সংস্থার নাম: জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন,

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ধনেশ্বরগতি, শালিখা, মাগুরা

বীর মুক্তিযোদ্ধা গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস

জনাব গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস উল্লেখ করেন যে, তিনি ১নং ধনেশ্বরগতি ইউনিয়নের মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডার ও বর্তমানে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ইউনিয়ন কমিটির সহ-সভাপতি। পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করছেন। এর জন্য তিনি পিকেএসএফ এবং জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আজ মনে পড়ে সেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদেরকে দেশ থেকে হটানোর জন্য বিনয়, বাদল, দিনেশ, ক্ষুদিরাম যখন প্রাণ বিসর্জন

দিলেন, এরপর থেকেই দেশমুক্তির আত্ম-উপলব্ধি হলো এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ জোগালো দেশমুক্তির প্রত্যয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের রানাঘাট ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে এমপি আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে চাপড়া বাঙালজি ক্যাম্পে পাঠানো হলো। সে সময় ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন ক্যাপ্টেন এস কে ব্যানার্জি। সেখানে তিনমাস প্রশিক্ষণ শেষ হলে বাংলাদেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমরা দেশে চলে আসি। ৮নং সেক্টর কমান্ডার মঞ্জুরের নেতৃত্বে আঞ্চলিক কমান্ডার শামসুর রহমানের বাহিনীতে আমি যোগদান করি। গাজীরহাট, আলমখালী, বুনাগাতী বিভিন্ন জায়গায় আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলে মাগুরা মিলিশিয়া ক্যাম্পে আমরা অস্ত্র জমা দেই। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে আমি বিবাহ করি। আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। দুঃখ কষ্টের মধ্যদিয়ে তিন সন্তানকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলি। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধা কোটার সুবিধা চালু করেন এবং আমার তিন জন সন্তান সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা সুবিধা পায়। এখন বড় ছেলে ময়মনসিংহ পুলিশ সুপার (পিবিআই), ছোট ছেলে যশোরে কাস্টমস কর্মকর্তা এবং আরেক মেয়ে ঝিনাইদহ পিটিআইতে শিক্ষক পদে কর্মরত আছে। আমি আজ যে সুখ ও সম্মানের সাথে বেঁচে আছি এর সবটুকু সম্ভব হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার কল্যাণে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে পেরেছি বলেই আমার মত মানুষ আজ সম্মানের সাথে বাঁচতে পারছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে নিজেরা আসীন হয়ে আমাদের দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারছি।'

সংস্থার নামঃ দিশা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বারুইপাড়া, মিরপুর, কুষ্টিয়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার মোঃ ছানা উল্লাহ

জনাব মোঃ ছানা উল্লাহ উল্লেখ করেন যে, 'ভারতের সিংভূম জেলার চাবুলিয়া হইতে গেরিলা যুদ্ধে ১ মাস ৫ দিন উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

তার মধ্যে পোড়াদহ ব্রিজ উড়ানোর সময় মিলিশিয়াদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণের দৃশ্য আমার বেশি মনে পড়ে। কারণ ব্রিজ উড়ানোর সময় মিলিশিয়ারা আমাদের ওপর অতর্কিত গুলি চালায়। আমরাও তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে থাকি। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ গুলি বিনিময় হয়। আমরা সংখ্যায় ছিলাম ৬০ জন। তিন দিক থেকে আমরা সমানে গুলি করতে থাকি। মিলিশিয়ারা এক পর্যায়ে গুলিবর্ষণ বন্ধ করে পিছনের রাস্তা দিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আমাদের কাছে সীমিত পরিমাণে গুলি থাকার কারণে প্রত্যেকেরই গুলি প্রায় শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমরা মিলিশিয়াদের পিছু ধাওয়া না করে নিরাপদ অবস্থানে চলে আসি। ঐদিন মিলিশিয়ারা ভীত অবস্থায় পলায়ন না করে আমাদেরকে আক্রমণ করলে হয়তো আমরা অনেকেই যুদ্ধে মারা যেতাম। আমাদের ওপর নির্দেশনা ছিলো- হিট অ্যান্ড রান। আঘাত করো এবং সরে পড়ো। ঐ দিনটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এটি একটি সমন্বিত প্রয়াস, বিশেষ করে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে আমি প্রবীণ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। আমরা চাই এই প্রোগ্রামটি দীর্ঘমেয়াদে চলমান থাকুক।'

সংস্থার নামঃ এসকেএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ সাঘাটা, গাইবান্ধা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল মান্নান মণ্ডল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে মর্মস্পর্শী ঐতিহাসিক ভাষণ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"- এর মাধ্যমে স্বাধীনতার যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন দীর্ঘ ৯ মাস পরে তা হতে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। এবার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হলো। আমরা স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছি। সেদিনের বপন করা বীজ থেকে জন্ম নিয়েছিলো চারা, স্বাধীনতার সেই গাছ এখন মহীরূহে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক দূর। আজ আমরা বিশ্ব দরবারে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি। আমরা গর্বিত, আমরা মহিমান্বিত। এর পেছনে যার অবদান অবিস্মরণীয় তিনি হলেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। আমি সকল মুক্তিযোদ্ধার পক্ষ থেকে তাঁকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি।

আমাদেরকে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আমরা মাঝে-মাঝে পথভ্রষ্ট হই। আমরা আজও দেখি কিছু হায়েনার দল চিৎকার করে ওঠে। আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের অর্জনকে বিনষ্ট করতে চায়। ঐক্যবদ্ধভাবে তাদেরকে রুখে দিতে হবে। আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ মানবিক রাষ্ট্র চাই। আমরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা চাই। যেদিন এদেশ মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে, সকল মানুষ তার ন্যায্য অধিকার পাবে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকবে না, ধর্মে ধর্মে রেষারেষি থাকবে না, সেইদিন এই স্বাধীনতা অর্জন সার্থক হবে। আমরা পাবো প্রকৃত স্বাধীনতা এবং এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। লাখো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে। আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হই।

আমি জানতে পেরেছি, পিকেএসএফ তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে অসংখ্য তরুণ যুব সমাজকে সংগঠিত করেছে। তরুণরাই আগামীর কর্ণধার। তারাই পারবে স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখতে। তাদেরকে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করতে হবে। আমাদের যুব সমাজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হলে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হতে পারে। তাই সেইসব সংগঠিত যুব সমাজকে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়ার জন্য আমি পিকেএসএফ-কে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, এই কাজটি একমাত্র পিকেএসএফ সঠিকভাবে করতে পারবে। আমি জেনেছি, পিকেএসএফ থেকে সারা বাংলাদেশের দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা করা হয়ে থাকে। আমাদের পাশের উপজেলা ফুলছড়িতে ১০ জন দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা করে অনুদান দেয়া হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারাদেশের মধ্যে সাঘাটা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বেশি। তাই সাঘাটা উপজেলার দরিদ্র অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সংস্থার নামঃ টিএমএসএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ তেতলি, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলকাছ আলী

আমি প্রথমে সেই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, যার জন্ম না হলে আমাদের দেশ স্বাধীন হতো না। সত্যি কথা বলতে গেলে মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেরণায় আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যুদ্ধকালীন সময়ে আমি ৪নং সেক্টরে ইউনিট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম যুদ্ধে। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে পেয়েছি স্বাধীন রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও চেতনায় সবসময় মানুষের উন্নয়নের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী থেকে ইতিহাসের মহানায়কে পরিণত হওয়ার কোনো পর্যায়েই গণমানুষের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাননি। জনতা ও নেতার এই বন্ধন কেবল মুখে প্রকাশ করার বিষয় নয়, এটি জীবনযাপনের অঙ্গীভূত বিষয় ছিলো বলে আমি মনে করি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গঠনে পিকেএসএফ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। আমি পিকেএসএফ-এর যুগান্তকারী উদ্যোগ 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মাধ্যমে আমার ইউনিয়নে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আমার ইউনিয়নে টিএমএসএস কর্তৃক সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এখানে স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা প্রতিদিন খানায় গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে, প্রতি গ্রামে গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে, প্রতি মাসে বয়স্ক ভাতা দেয়া হচ্ছে, গ্রামের লোকজন এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে, যুবদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে এবং উদ্যমী সদস্যদের পুনর্বাসন করাসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর প্রতি আবারও সালাম জানাচ্ছি এই কারণে যে, তিনি যেভাবে দেশকে গড়তে চেয়েছিলেন বা তাঁর যে উন্নয়নের চিন্তা ছিলো, ঠিক সেইভাবেই আমার ইউনিয়নে টিএমএসএস সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিগত বছরের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে আমি বলবো যে, আমার ইউনিয়ন আজ অনেক সমৃদ্ধ। আমি

এই সভায় অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ জন্য পিকেএসএফ এবং টিএমএসএস-কে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরিশেষে মহান নেতার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সংস্থার নাম: বাসা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: দুর্গাপুর, কাপাসিয়া, গাজীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইসলাম

শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলাদেশ থেকে ঘোড়াশাল জুট মিলের শ্রমিক নেতার আদেশে প্রথম দিন ৪টি নৌকাতে করে আমরা ৮০ জন বেলাবো হয়ে হেঁটে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। তখন ছিলো বর্ষাকাল। বেলাবো ক্যাম্পের মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ আমাদের যেতে নিষেধ করে। কারণ, এর আগের দিন হানাদার বাহিনী আর্টিলারি দিয়ে সেল মেরে ৩টি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এতে করে ৩টি নৌকার ৬০ জন লোক মারা যায়। অবশেষে একটি নৌকায় করে মাত্র ২০ জন ভারতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আমরা ৮০ জন প্রত্যেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে মুক্তিবাহিনী কমান্ডারের হাতে দেই যেখানে লেখা ছিলো, আমরা পথিমধ্যে মারা গেলে তার জন্য আপনারা না, আমরাই দায়ী থাকবো। পরে কমান্ডার তাদের লোকদের আদেশ করলো ৪টি নৌকা আনার জন্য। পরবর্তীকালে আমরা ৮০ জনই ভারতে পৌঁছাতে সক্ষম হই। আমরা একরাত্র আগরতলা কংগ্রেস ভবনে অবস্থান করি। তার পরেরদিন সকাল ১০ টায় আগরতলা থেকে আমাদের ৮০ জনকে ৪টি ট্রাকে করে পালাটানা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তখন আমরা সেখানে প্রশিক্ষণ শেষ করি। তিন মাস প্রশিক্ষণ করে হেজামারা ক্যাম্প থেকে অস্ত্র নিয়ে আমরা কুমিল্লার কসবা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকি। আমি ২নং সেক্টরের গাজীপুরের কাপাসিয়া থানায় যুদ্ধ করেছি। আমরা ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ দিকে কালীগঞ্জ থানা, উত্তর দিকে কালিয়াকৈর থানা এবং পূর্ব দিকে কাপাসিয়া থানা আক্রমণ করি। আক্রমণের সময় সকাল ১০টায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানের হানাদারের গুলিতে মারা যায়, তখন আমাদের ওস্তাদ থানা এবং গ্রুপ কমান্ডার পাগলা বাঁশি দেওয়া শুরু করলো। এর অর্থ হলো, যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে। তিনি আমাদের গুলি ছুড়তে অর্ডার

করলেন। তখন আমরা তিন দিক থেকে আক্রমণ শুরু করলাম। পাকিস্তানের সৈন্যরা পশ্চিম দিকে অর্থাৎ পিছিয়ে ঢাকার দিকে রওনা করলো। তখন শীতকাল, মনে হয় পৌষ মাস। মনে পড়ে, আমার এক সাথী মুক্তিযোদ্ধা যখন বসা থেকে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, সাথে সাথেই পাকিস্তানের সেনারা আমার বন্ধুকে বুকে গুলি করে, আর বন্ধু সাথে সাথেই মারা যায়। সে এমনই সাহসী ছিলো যে, ভারতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ২.৫ মণ কমলার বস্তা মাথা -য় নিয়ে হেড অফিস থেকে ২০-৩০ ফুট উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়েছিলো। এর জন্য কমান্ডার তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

সংস্থার নাম: ডাক দিয়ে যাই

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কলাখালী, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ মান্নান হাওলাদার

আমি পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায় সেনাবাহিনীর আর্টিলারি বিভাগে নিযুক্ত ছিলাম। সরকারি চাকরির সুবাদে সপরিবারে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করতাম। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক অবনতি ঘটতে থাকলে দেশ স্বাধীন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মেজরের কাছে ছুটির আবেদন করলেও মেজর ছুটি না দিতে টালবাহানা শুরু করেন। অতঃপর দেশের টানে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার জন্য নানা কৌশল খুঁজতে থাকি। ইতোমধ্যে দেশের দ্বীপ জেলা ভোলায় ১৯৭০ সালের ভয়ংকর প্রাকৃতিক ঝড় আঘাত হানে। সুযোগ হলো আরও একটি অজুহাত দাঁড় করানোর। আবারও ছুটির জন্য সংশ্লিষ্ট মেজরের কাছে আত্মীয়-স্বজন মারা যাওয়ার অজুহাত উপস্থাপন করে ছুটি মঞ্জুর করে নিই। নানা চড়াই উতরাই পার করে সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসি। দেশে ফিরেই ঝাঁপিয়ে পড়ি দেশকে হানাদার মুক্ত করার জন্য। প্রথমে আমার এলাকা পিরোজপুরে লোক সংগঠিত করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। অতঃপর সাতক্ষীরা জেলায় সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সাতক্ষীরা জেলাকে শত্রুমুক্ত করি। পরবর্তীকালে খুলনা জেলার রেডিও স্টেশন এলাকায় আক্রমণ করে পাকবাহিনীকে পরাজিত করে রেডিও স্টেশন এলাকা দখল করি। পর্যায়ক্রমে চুয়াডাঙ্গা জেলাকে শত্রু মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা শত্রুমুক্ত করি। সেই যুদ্ধে ২৬ জন পাকহানাদার বাহিনীকে খতম করি।

এভাবেই আমি মুক্তিযুদ্ধে সামনের কাতারে থেকে যুদ্ধ করে পাকবাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রাখি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ স্বাধীনের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষকে শত্রুমুক্ত করতে পেরে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্ব বোধ করি।

সংস্থার নাম: মমতা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: গড়দুয়ারা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী আকবর

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় উপস্থিত আজকের সভার সম্মানিত সভাপতি পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ সদস্যবৃন্দ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপস্থিত সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ; হাটহাজারী গড়দুয়ারা ইউনিয়ন ও মমতা সমৃদ্ধি কর্মসূচির পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা। আজকের আলোচ্য বিষয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধু একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম না নিলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না, এটা চিরন্তন সত্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব থেকেই সাধারণ মানুষ, বিশেষত গরিব চাষিদের দুর্দশা দেখে কাতর হতেন, ভাবতেন কিভাবে তাদের মুক্তি অর্জিত হতে পারে, রাজনীতিতে যুক্ত হবার পর থেকেই স্বপ্ন দেখতেন একটি সুন্দর স্বাধীন দেশ। আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম। সমৃদ্ধি কর্মসূচির গড়দুয়ারা ইউনিয়নে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'মমতা' ২০১৭ সাল থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, যুব উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে এবং ২০১৮ সাল থেকে প্রবীণদের সাথে কাজ করছে। যার ফলে বর্তমানে গড়দুয়ারা ইউনিয়নের জনসাধারণ অনেক উপকৃত হচ্ছে, যা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক

হচ্ছে। এর জন্য আমি পিকেএসএফ এবং মমতাকে গড়দুয়ারাবাসীর পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করছি, পিকেএসএফ থেকে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে গড়দুয়ারাবাসী উপকৃত হবে।

সংস্থার নাম: আরডিআরএস বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ভজনপুর, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়

বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ মনসুর আলী

আস্সালামুআলাইকুম। আমি মোঃ মনসুর আলী, সনদ নং ম-৫৬২৪৯, ভজনপুর ইউনিয়ন, তেঁতুলিয়া উপজলোর, পঞ্চগড় জেলার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমাদের বাড়িটি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সমর্পণ করে আমরা সপরিবারে ভারতে চলে যাই। পরবর্তীকালে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিং ক্যাম্পে যাই। সেখানে ২৮ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে জলপথে বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলায় প্রবেশ করে সীমান্ত এলাকাতেই পাকবাহিনীর সাথে আমরা যুদ্ধ শুরু করি। সেদিন প্রায় ১৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হয়ে শত্রুপক্ষের ওপর গুলিবর্ষণ করি এবং প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যুদ্ধের এক পর্যায়ে রংপুরের ঘাঘট নদীতে আমাদের নৌকা ডুবে গেলে তাতে থাকা আমাদের সকল হাতিয়ারও তলিয়ে যায়। এই সময় আমরা কোনোমতে আশেপাশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে জীবনরক্ষা করি।

পরবর্তীকালে পঞ্চগড়ের বেরুবাড়ি ক্যাম্পে থেকে আমরা দীর্ঘ ৩ মাস যুদ্ধ করি। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। আমরা আমাদের সকল হাতিয়ার ঠাকুরগাঁও পিটিআই কার্যালয়ে জমা দিয়ে বীরের বেশে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে আসি।

সংস্থার নাম: শতফুল বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বানেশ্বর, পুটিয়া, রাজশাহী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৭১ সালের জুন

মাসের শুরুর দিকে পার্শ্ববর্তী বিড়ালদহ গ্রামের জনাব মোঃ লস্কর সুবেদারের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণে যোগদান করি। পরবর্তীকালে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে গমন করি। ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার কাজীপাড়া ও শেখপাড়া গ্রামে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং দেশে ফিরে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমরা সবাই মুজিবসেনা। দেশ স্বাধীন করাই ছিলো আমাদের মূল লক্ষ্য। আমি প্রায় সময়ই আর্মিদের সাথে থেকে যুদ্ধ করেছি। প্রথমে আমরা রাজাকার ক্যাম্পে অপারেশন চালাই। সাহস বাড়তে থাকে। তারপর শান্তি কমিটিকে আঘাত করি। পর্যায়ক্রমে সকল ঘাঁটি আমাদের দখলে আসে। ১৯৭১ সালের সেই ভয়াল দিনের কথা মনে হলে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের কথা বর্ণনা করতে গেলে চোখে জল এসে যায় বারবার। সেই সময়ের কথা কি বলবো! খাবার নাই, থাকার জায়গা পাওয়া যে কি কষ্ট; বন জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার; সব সময় মৃত্যুকে সাথে নিয়ে পথ চলতে হয়েছে। সবকিছুর সাথেই চলে যুদ্ধ আর যুদ্ধ। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারতাম না। শেখ মুজিব না জন্মালে মুক্তিযুদ্ধ হতো না, দেশ স্বাধীন হতো না, এটা আমরা সবাই জানি। কথাগুলো বলতে গেলে আবেগে আমার চোখ ভারী হয়ে আসে। আমার দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। একজন ছেলে রাজশাহী সুগার মিলে কর্মরত, আরেকজন মুদি ব্যবসায়ী। তিন মেয়েকে সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়েছি তারা যার যার সংসারে সুখে শান্তিতেই আছে। আমি মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাই, আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি। বানেশ্বর ইউনিয়নে চলমান সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ০৪নং ওয়ার্ড কমিটিতে আমি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। শিক্ষা সহায়তাকেন্দ্রে আমার নাতি-নাতনীরা পড়ালেখা করছে এবং আমি ও আমার পরিবারের সকলে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র স্বাস্থ্যসেবা নিয়মিত গ্রহণ করি। এছাড়া, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় প্রবীণদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের নিয়ে সময় কাটানোর উত্তম ব্যবস্থা করার জন্য আবারো পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও শতফুল বাংলাদেশের প্রতি কৃ-তজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সংস্থার নামঃ হীড বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ আইলা পাতাকাটা, বরগুনা সদর, বরগুনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল হক সানু

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল হক সানু আইলা পাতাকাটা ইউনিয়নবাসীর পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা না চাইতেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কিছু দিয়েছেন, এজন্য বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ৩০ হাজার গৃহ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। সকল মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে সরকারি চাকরি এবং প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার জন্য একটি করে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করলে মুক্তিযোদ্ধারা মৃত্যুবরণ করলেও তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে। পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মাধ্যমে আইলা পাতাকাটা ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশেষ সঞ্চয়সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে সহায়ক বলে আমরা মুক্তিযোদ্ধাগণ মনে করি। কিন্তু বিভিন্ন ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা করা হলেও আমাদের এখানে তা করা হয়নি। অসহায় ও দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের আরো বেশি সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করছি। পরিশেষে পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মহোদয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এস এম নুরুল আলম

নির্বাহী পরিচালক, আরব, মানিকগঞ্জ

আমরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করলেও তার সুফল এখনও পাইনি এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি এখনও আমাদের স্বাধীনতাকে বিলীন করে দিতে চাচ্ছে। আমি মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ছিলাম এবং মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে খেয়ে না খেয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছি। আমরা কয়েকজন ক্যান্টনমেন্ট থেকে অল্প কিছু অস্ত্র নিয়ে মানিকগঞ্জ অঞ্চলে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করি। অবশেষে,

সকল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি মিলে দেশ থেকে স্বাধীনতা বিরোধী সকল অপশক্তির পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী

নির্বাহী পরিচালক, নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল শহিদ এবং গাজী মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করলেও এখনও মুক্ত হতে পারিনি। বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল শওকত আলীর স্ত্রী হওয়ায় ১৯৬৬-৬৮ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার স্বামীর সাথে বিভিন্ন আলাপ আলোচনার সাক্ষী আমি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার স্বামী একই মামলার আসামী ছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির আব্দুল জব্বার

নির্বাহী পরিচালক, কেকেএস

চেয়ারম্যান, রাজবাড়ী জেলা পরিষদ

১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল ভোর সাড়ে ৫টা। সেদিন ছিলো বুধবার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গোয়ালন্দে মুক্তিযোদ্ধা, ইপিআর এবং নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দ্রুম দ্রুম বোমার আওয়াজ শুনে এসডিও কর্তৃক প্রেরিত ১০টি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল নিয়ে বাসা থেকে গোয়ালন্দ মালখানার দিকে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি আনছার কমান্ডার ফকির মহিউদ্দিন আনসারদের অস্ত্র বের করে দিচ্ছে। যুদ্ধের এই প্রস্তুতি দেখে তৎকালীন একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সকল ছাত্রকর্মী ভাইদের বাহাদুরপুরের দিকে আসার জন্য খবর পাঠাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলেই জড়ো হতে থাকে। পূর্বেই আমার কাছে অস্ত্র থাকায় তা নিয়ে আমি এবং আমার চাচা ফকির মহিউদ্দিন দুজনে বাহাদুর সরদারের পাড়ায় (যেখানে ফেরি ঘাট ছিলো) রওনা দিই। সেখানে ইপিআরগণ পাকিস্তান বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য বাংকার তৈরি করেছে। চাচা আমাকে বলেন, তোর তো ট্রেনিং নেই। তোর যদি ক্ষতি হয় তোর আব্বাকে আমি কী উত্তর দেব? আমি বললাম, আপনার তো বয়স হয়েছে। আমরা যুবকরা সামনে এগিয়ে যাই, আপনি বাড়ি চলে যান। তাৎক্ষণিক চাচা একটা চিৎকার দিয়ে দূরে চলে যান এবং পজিশন নিতে

বলেন। স্টিমার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে। আমার সাথের সকল বন্ধুরা দেশিয় অস্ত্র নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। সকলকে নিরাপদে যেতে নির্দেশ দিয়ে আমি মুখোমুখি না গিয়ে পেছন দিক দিয়ে ফিরে এসে বাংকারের দিকে রওনা দিই। বাংকারের মধ্যে ইপিআরদের পাশাপাশি এক আনসার সদস্যও গুলি করার জন্য প্রস্তুত। আমি কোনমতে ঐ বাংকারে ঢুকলাম। এর মধ্যে শুনতে পেলাম একটি গানবোট এবং একটি স্টিমার চরকর্ণেশোনায় এক প্লাটুন আর্মি নামিয়েছে। তখন সবাই সাঁড়াশি আক্রমণের মধ্যে পড়লাম। পূর্বদিকে তাকালে দেখতে পাই কর্ণেশোনার দিক থেকে ঐ বাহিনী গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে হেঁটে আসছে। অন্যদিকে সিক্স ইঞ্চি মর্টারসেল তারা আরিচার দিক থেকে আমাদের দিকে মারছে। আমি সহযোদ্ধা আক্কাছকে বললাম এটিই বুঝি আমাদের কবর রচনা করবে। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে গানবোট আর স্টিমার আমাদের কাছাকাছি চলে এলো। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমরা নদীর পাড়ালের ফাঁকে থ্রি-নট-থ্রি দিয়ে বাংকার থেকে গানবোটের ওপর গুলি করতে থাকলাম। বাহাদুরপুর যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ওরা গোয়ালন্দ বাজারের ফেরি ঘাটের দিকে চলে গেলো। গোয়ালন্দ বাজারে এসে স্টিমার থামলো। পাক আর্মিদের নামতে দেখে আমরা বাহাদুরপুর এলাকা থেকে যার যার মত নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটলাম। পাক আর্মিরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে একটি গ্রুপ ঘাট থেকে রেল ধরে কুমড়াকান্দির দিকে আরেকটি গ্রুপ বাজারের দিকে ছুটলো। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা তখন ঘাট অঞ্চল থেকে অনেক দূরে নিরাপদে। আমাদের কাছে খবর আসলো তারা যেখানে যেখানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো দেখেছে সেখানেই গান পাউডার দিয়ে জ্বালিয়ে পুঁড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আর সামনে যাকে পেয়েছে পাখির মত গুলি করে হত্যা করেছে। গোয়ালন্দের ঐ দিন যুদ্ধে বহু লোক শহিদ হয়েছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী আহমেদ

সভাপতি, উন্নয়ন, খুলনা

জনাব ফেরদৌসী আহমেদ পিকেএসএফ-এর সভাপতিসহ সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বে তিনি খুলনা জেলায় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন এবং যুদ্ধ পূর্বকালীন

সময়ে তাঁর ওপর বিভিন্ন অসহনীয় ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বর্ণনাতীত ভোগান্তি এবং মুক্তিযুদ্ধে তার স্বকীয় অংশগ্রহণ কীভাবে হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। পরিশেষে, তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে এমন একটি ওয়েবিনার আয়োজন করায় সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর রহমান বিশ্বাস

নির্বাহী পরিচালক, নিউ এরা ফাউন্ডেশন

জনাব মঞ্জুর রহমান বিশ্বাস অনুষ্ঠানের সভাপতি, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ পিকেএসএফ-এর সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, 'আমি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক, জয় বাংলার সৈনিক। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমানের শিক্ষা আন্দোলন থেকে আমার রাজনীতিতে হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে তা পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়ে রূপ নেয়। জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব আব্দুর রাজ্জাক, শেখ শহিদুল ইসলাম, খালেদ মোহাম্মদ আলী, জনাব শাহজাহান সিরাজ এবং আ স ম আব্দুর রব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে এসে আমি ছাত্র রাজনীতিতে আরও সমৃদ্ধ হই। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অবস্থান করতাম। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ৭ই মার্চ হল থেকে মিছিল নিয়ে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হয়েছিলাম এবং ডায়াসের সামনে বসে বঙ্গবন্ধুর সেই জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে আমি গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসি এবং বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে আরও কিছু ছাত্রলীগের কর্মীসহ ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য রওনা দেই। পথিমধ্যে নৌকাডুবির কারণে আমার ছয় জন বন্ধুকে হারাই। পরে আমরা ভারতের জলাঙ্গী পৌঁছাই এবং সেখান থেকে কলকাতায় চলে যাই। সেখানে বাংলাদেশ থেকে আরও অনেক নেতাকর্মী হাজির হন এবং তারা বর্ডারের কাছে ক্যাম্প করেন। পরে সেখানে তাজউদ্দিন আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ ও নূর এ আলম সিদ্দিকী হাজির হন। পরবর্তীকালে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের সংসদ সদস্য হওয়ারও গৌরব অর্জন করি।' জনাব বিশ্বাস সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রশংসা করেন এবং এই কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম

নির্বাহী পরিচালক, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

জনাব রফিকুল আলম সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, ১৯৬৬ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় আমি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। বঙ্গবন্ধু তনয় শেখ কামালের সহপাঠী ছিলাম আমি এবং তার ফলে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত ছিলো। তিনি উল্লেখ করেন, '৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির সাথে মুক্তিযুদ্ধের একটি যোগসূত্র রয়েছে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হল '৬৬-এর আন্দোলনের সম্প্রসারিত ফল। তিনি ঢাকা শহরের ছাত্রলীগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি কুমিল্লা থেকে শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ভারতে গমন করেন। তিনি সত্তরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে এবং সাধারণ মানুষের জন্য জমির খাজনা মওকুফ থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা তুলে ধরেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি অস্ত্র জমাদান করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মহসীন আলী

নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

জনাব মহসীন আলী অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং উপস্থিত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, '১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় প্রথম রাজনৈতিক ভাবনা শুরু করি। পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবিতে যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ করেন, তখন থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এমন একজনকে পাওয়া গেছে যিনি দেশের মানুষের প্রাণের দাবির কথা বলছেন। এরপর থেকে আমি ধীরে ধীরে ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হই। প্রথমে আমি ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হই এবং পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে আমি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হই। বিভিন্ন সভা সমাবেশ এবং ১১ দফা দাবি তুলে ধরার সময় আমি সক্রিয় ভূমিকা পালন করি।' ছাত্র আন্দোলনের মুখে বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে মুক্তি পান এবং

জাতির জনক উপাধি পান। তিনি বলেন, এই ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তিনি আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, সত্তরের নির্বাচন আমি সরাসরি প্রত্যক্ষ করি এবং উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করলেও তারা যেন ক্ষমতায় না আসতে পারে চারিদিকে সেই চক্রান্ত চলছিলো। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা করার পর সকল স্তরের মানুষ এটার প্রতিবাদ জানায় এবং মূল স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ৭ই মার্চ আসে এবং সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করা হয়। পাকিস্তান সরকার রেডিও প্রচার বন্ধ করে দেয় এবং পরবর্তীকালে বিবিসি থেকে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ সবার মাঝে ছড়িয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে আসে ২৫শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা। আমি ১৯৭১ সালের মে মাসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বের হয়ে প্রথমে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে গমন করি।' তিনি বলেন, যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু কৃষিক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটিয়েছেন তার সুফল এখনও আমরা পাচ্ছি। আমাদেরকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ থেকে বৈষম্য দূরীকরণের ওপর জোর দিতে হবে বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম এ সামাদ

নির্বাহী পরিচালক, সিসিডিএ

১৯৭১ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলের একজন আবাসিক ছাত্র। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় ছাত্রদের হল ছাড়ার নির্দেশের প্রেক্ষিতে প্রায় সকলেই হল ছাড়লেও আমরা মাত্র ২০ জনের মত ছাত্র হলে থেকে যাই। রাত ১২টার দিকে প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভাঙ্গলে জানালা দিয়ে দেখি হাজার হাজার আলোর বাতি। বুঝতে পারি আর্মিরা আক্রমণ করেছে। ২৬শে মার্চ সকাল বেলা অনির্দিষ্টকালের জন্য শহরে কারফিউ জারি হয়। ২৭শে মার্চ সকালে কারফিউ শিথিল করায় হল থেকে বেড়িয়ে পড়ি। রাস্তায় মানুষের ঢল- শহর ছেড়ে গ্রামের পথে। অনেক কষ্টে ২৮শে মার্চ সকালে লক্ষ্মীপুরে আমাদের বাড়ি পৌঁছাই।

সেদিন থেকে রায়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে শুরু করি লঙ্গর খানা। পাশাপাশি যুবকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করি। স্বাধীনতার ডাক আসবে যে

কোনো সময়। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আগরতলা যাই। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কুমিল্লা-ত্রিপুরা সীমান্তে মতিনগর ক্যাম্পের উদ্বোধন হয়। সেখানে দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণের পর বেশকিছু গ্রেনেডসহ আমাদের নয়জনকে দেশে পাঠানো হয়। মে মাসের ১৯ তারিখ লক্ষ্মীপুরের এক কুখ্যাত রাজাকারের বাড়িতে আমরা গ্রেনেড চার্জ করি। ২৩শে মে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর্মিরা আমাদের এলাকায় আক্রমণ করে। পাক সেনারা আমাদের বাড়িসহ রায়পুর ও জিংলাতলীর অনেক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। আমি বাড়িতেই ছিলাম। খবর পেয়ে বাড়ির পাশে নদীর অপর পাড়ে চলে যাই।

অতঃপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য আবার বেরিয়ে পড়ি। প্রশিক্ষণ শেষে দাউদকান্দি এলাকায় আমাদের বাহিনী অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করে। জিংলাতলী ব্রিজ আপারেশন ছিলো আমার জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়। আমাদের অবস্থান ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের পেছন থেকে পাক আর্মি আক্রমণ করে। অল্পের জন্য আমরা রক্ষা পাই। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাড়ি ফিরে আসি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মোঃ এ বি এম আব্দুল্লাহ

সভাপতি, দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)

ডা. মোঃ এ বি এম আব্দুল্লাহ বলেন, ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তির পর থেকে ঢাকা শহরে যত গণআন্দোলন হয়েছে তার সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তবে বাংলাদেশের জন্মের আগে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলেন না। তিনি উল্লেখ করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ আরও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি গ্রুপ গড়ে তোলেন এবং কিভাবে যুদ্ধকালীন শত্রুর মোকাবেলা করা যায়, কোথা থেকে অস্ত্রের যোগান আসবে সেটা নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা বুয়েটের একটি আবাসিক হলে অস্ত্র এবং বোমা বানাতে চেষ্টা করেন। তিনি আরো বলেন, তিনি প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে ন্যাপ-এর রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল জোটের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নিজেদের তৈরি বোমা এবং এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তেজগাঁও এলাকাতে তাঁরা পাকবাহিনীকে

সারারাত আটকে রাখেন। ১৯৭১ সালের ১৪ আগস্ট পাকবাহিনী তাঁর নানা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন অল্পের জন্য রক্ষা পান। তিনি ৬২ থেকে শুরু করে ৬৬ এর ছয়দফা, ৬৯ এর ১১ দফাসহ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান মহোদয়কে মানবপ্রেমিক অর্থনীতিবিদ হিসেবে উল্লেখ করেন।

জনাব অরিজিৎ চৌধুরী

অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও

পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, পিকেএসএফ

জনাব অরিজিৎ চৌধুরী অনুষ্ঠানের সভাপতি, উপস্থিত সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ লাখো শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা নিজেরা সব অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে পারি তা করতে হবে।' তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব নাজনীন সুলতানা

পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, পিকেএসএফ

জনাব নাজনীন সুলতানা উপস্থিত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁদেরকে একত্রিত করার জন্য পিকেএসএফ-কে সাধুবাদ দেন। তিনি বলেন, ১৯৬৯ সালে বদরুন্নেসা মহিলা কলেজে ভর্তির পর থেকেই ছাত্র রাজনীতির সাথে তিনি জড়িত ছিলেন এবং ৬৯-৭১ সময়কালীন প্রায় প্রত্যেকটা আন্দোলনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত ছিলেন এবং তখনকার প্রায় প্রত্যেকটা সংগঠনের একটাই দাবি ছিলো, আর সেটা হলো স্বাধীনতা। ৭ই মার্চের ভাষণের দুই দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে রাইফেল

প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং সেখান থেকে তিনি অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীকালে ২৫শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া, তাদেরকে খাবার এবং সংবাদ সরবরাহ করা ইত্যাদি কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধা মর্যাদা পেয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ভূখণ্ড হিসেবে স্বাধীন হলেও আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করেছি সেই অর্থনৈতিক মুক্তি এখনও মেলেনি। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে আমরা সেই অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি এবং অচিরেই আমরা সেখান থেকে মুক্তি পাবো বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব পারভীন মাহমুদ

পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, পিকেএসএফ

অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং যাদের রক্ত ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে এবং যাদের নিরলস ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব পারভীন মাহমুদ বলেন, আজকে মনে হচ্ছে আমরা সেই একাত্তরে ফিরে গিয়েছি। স্বাধীনতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সকলের কম-বেশি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমার আম্মা এবং মামারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং যুদ্ধে শরিক হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আর ফিরে আসেননি। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিজয়ের যে উল্লাস ছিলো তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের বয়ান সংকলনের সাথে সাথে যদি তখনকার সময়ের কোনো লেখা যোগ করা যায় তাহলে সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে তিনি মনে করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩রা জুন, ১৯৭১ নিম্নোক্ত কবিতাটি তাঁর লেখা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতীক্ষা

-পারভীন মাহমুদ

রাত থমথম স্তব্ধ আকাশ
শহরতলীটি মৌন, চেতনাহীন, নিঃসাড়
অথবা ভীত, আতঙ্কিত।
মানুষ নামের কীটগুলো জড়োসড়ো
মৃত্যুর আগমনী বার্তায়।
খুপরিতে বসে গুণছে প্রহর
ভয়াল রাত্রির অবসান।
রাস্তায় ইতস্তত ঘুরছে হানাদার কুকুরগুলো,
রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে যাচ্ছে শোনা
শিকারলোভী কুকুরদের পৈশাচিক উল্লাস।
সেই উল্লাস ধ্বনিতে উঠছে কেঁপে
খুপরির মানুষগুলো।।
অন্ধকার কালরাত্রির বুঝি শেষ নাই,
মানুষগুলো অপেক্ষা করছে-
বিংশ শতাব্দীর চন্দ্র বিজয়ের যুগে
এক টুকরো আলোর ইশারার।
জঙ্গীশাহীর কুকুরগুলো যদি জানতে পারে
অন্ধকার শহরে এখনো রয়েছে জীবনের অস্তিত্ব
নরপশুরা আসবে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে
তাই-
সভ্যযুগের অসভ্য পশুদের ভয়ে
নিরস্ত্র মানুষগুলো ভীত, সন্ত্রস্ত।
আঁধার গুহার আতঙ্কিত প্রাণিগুলো
স্বপ্ন দেখছে অথবা দেখতে চেষ্টা করছে
পূর্ব দিগন্তে নবোদিত সূর্যের
নবারুণ রাগের এক টুকরো মোনালিসার হাসির।

জনাব মুন্সী ফয়েজ আহমেদ

পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, পিকেএসএফ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই আয়োজনের জন্য জনাব মুন্সী ফয়েজ আহমেদ পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যাঁরা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন নিঃসন্দেহে তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং তাঁদেরকে আমরা সব সময় সর্বোচ্চ সম্মান প্রদানে সচেষ্ট থাকবো। আমাদেরকে দুই শ্রেণির মানুষ থেকে সচেতন থাকা উচিত। তাঁদের মধ্যে এক শ্রেণি যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপক্ষ শক্তি ছিলো এবং এখনো বিভিন্নভাবে দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান করে দেশের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। আরেক শ্রেণির মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে যাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান করলেও পরবর্তীকালে পথভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের লোভ-লালসা, ব্যক্তিস্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন এবং বিভিন্ন সুযোগের সন্ধানে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান করছেন। তিনি সমৃদ্ধি কর্মসূচির ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ের ইতিবাচক সাড়ায় নিজের মুগ্ধতা প্রকাশ করেন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচি প্রকৃত অর্থেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে সহায়তা করবে বলে তিনি মনে করেন।

সমাপনী বক্তব্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

আজকের অনুষ্ঠানে যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন এবং যাঁরা বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু সময় সংকটের কারণে সম্ভব হয়নি, তাঁদেরকে নিজেদের লেখা পাঠানোর জন্যে সভাপতি মহোদয় অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, আমরা এক অসাধারণ সময় অতিবাহিত করছি যখন একই সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করার সুযোগ হয়েছে। এই দুইটি বিষয়ই

(বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা) আমাদের কাজে-কর্মে, বক্তব্যে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে মাঝে মাঝেই বিশেষ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আলোচনা, সভা-সেমিনার করি এবং এক ধরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই। কিন্তু আমরা কয়জনইবা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করি এবং তা অন্তরে ধারণ করি। আমরা যা বলি তা যদি প্রকৃতপক্ষেই ধারণ করতে পারি এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, অন্যথায় তা বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আসুন আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করি; তা অন্তরে ধারণ করার চেষ্টা করি এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে তা বাস্তবায়ন করি; তাহলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন হবে। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানেই কাউকে বাদ দিয়ে নয় বরং সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আবার কাউকে অন্তর্ভুক্ত করলেও সে যদি ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে না।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ৩টি কবিতা রচনা করেন। যেগুলো হলো:

১) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে পরম শ্রদ্ধায়

২) বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা

৩) বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে পতপত

সভায় তিনি বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা কবিতাটি আবৃত্তি করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা

-কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

দীর্ঘ সংগ্রাম ত্যাগ জেল-জুলুম এবং চড়াই উৎরাই শেষে
বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় এবং অসম প্রত্যয়ী আহ্বানে
মুক্তিকামী বাঙালি একাত্তরের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে
দৃঢ় সংকল্পে এবং মাত্র নয় মাসের যুদ্ধেই বিজয় আনে ছিনিয়ে।
এ বিজয় যে জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন এ কথা বলতেই হবে নির্দ্বিধায়।

মুক্তিযুদ্ধটি চলে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের সদাজাগ্রত অনুপ্রেরণায়,
হয় অনিবার্যভাবে সশস্ত্র, হয় রণকৌশলে, হয় রক্ত ঝরিয়ে,
হয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতায়, হয় কলম দিয়ে, হয় কণ্ঠ দিয়ে,
হয় কূটনৈতিক চালে, হয় জাতির সার্বিক সহযোগিতায়,
হয় যখন যেভাবে শত্রুকে পর্যুদস্ত করা যাবে সেই কায়দায়।

সমুখ সমরে প্রাণপণ যুদ্ধ করে সশস্ত্র বীর মুক্তিযোদ্ধারা
আর নানাভাবে শক্তি যোগায় অন্য সকলে, আপামর জনসাধারণই–
স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকাতলে জাতির চূড়ান্ত ঐক্যবদ্ধতা
এনে দেয় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ– মোহন বাঁশির সুর।
এ দেশের অল্প সংখ্যক পাকিস্তানপন্থী মানুষ রয় বাংলার শত্রু;
দেশীয় এই কুচক্রী মহল স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়,
দেশপ্রেমিকদের ওপর চালায় অত্যাচার-নির্যাতন, ঘটায় অসংখ্য হত্যা।

এক সাগর রক্ত, অপরিসীম ত্যাগ, বিরল তিতীক্ষা, অসহ যন্ত্রণা
সবই ঘটেছে স্বাধীনতাকে আনতে, দেশকে শত্রুমুক্ত করতে।

বাঙালির এই স্বাধীনতা এসেছে অনেক দামের বিনিময়ে–
লাখো শহীদের রক্ত, অত্যাচারিত অসংখ্য মানুষের ভোগান্তি;
ছেলে হারানো এবং মেয়ে হারানো সব মা-বাবার আহাজারি;
স্বামী হারানো সব স্ত্রী এবং স্ত্রী হারানো সব স্বামীর আর্তনাদ;
ভাই হারানো সব বোন এবং বোন হারানো সব ভাইয়ের মর্মবেদনা;
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের শহর বন্দর গ্রাম সর্বত্র
মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বাঙালির ভয় ভীতি শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার জীবন।

যারা সমুখ সমরে যুদ্ধ করেছেন, শহিদ হয়েছেন সেই ১৯৫২-এর
ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ জয় পর্যন্ত তারা সব আর
পাকিস্তানি ও তাদের বাঙালি দোসরদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার
বাঙালি নারী যত, তাদের সবাইকে যে জন খাঁটি বাঙালি সে জন
ধারণ করবে মনের গহিনে অতীব যতনে গৌরবে, আর অবশ্যই
কৃতজ্ঞচিত্রে গভীর শ্রদ্ধা জানাবে মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি।

মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বরণীয় তারা সসম্মানে ভালবাসায়
একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সকলকে ন্যায্য সম্মান দিতে হবে অকৃপণতায়।
পাশাপাশি স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধপরাধীদের মধ্যে যাদেরকে এখনও
বিচারে আনা যায়নি, তাদের সবাইকে অবশ্যই কৃতকর্মের জন্য
বিচারের মুখোমুখি করতে হবে, দিতে হবে আইন-নির্ধারিত দণ্ড।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাক দৃপ্ত পদক্ষেপে উন্নয়নে উৎসবে
সবার ন্যায্য অংশগ্রহণে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাঙলা গড়ে তুলতে।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় মুক্তিযোদ্ধাদের জয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে পরম শ্রদ্ধায়

-কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সময় বয়ে চলে অবিরাম আপন মনে টিক টিক টিক
নাই শ্রান্তি, নাই বিরতি, নাই পিছুটান, নাই কোনো দিশ।
সেই কোন সুদূর অতীতে শুরু, মানুষ তা জানে না
কোন আগামী পর্যন্ত চলতে থাকবে বিরতিহীন, তাও না।

সময়ের এই পথ পরিক্রমায় মানুষ আসে পৃথিবীতে
এবং নির্দিষ্ট সময়ের আতিথ্যের পালা সাঙ্গ হলে যায় চলে।
একজন মানুষের আসা যাওয়ার মাঝখানের পার্থিব ঠিকানা
হতে পারে কয়েক দশকের, কদাচিত হয় তা একশত বছর।

চব্বিশ ঘন্টা দিন হিসাবে একশত বছর অনেক দিন যদিও
মহাকালের অনন্ত যাত্রাপথে থাকে না এর কোনো চিহ্নই।
তবে বিশেষ কোনো অর্জনের দিন আর কোনো ব্যক্তি মানুষের
বিশেষ অর্জন সময়ের গতিপথে হয়ে থাকে চিহ্নিত, উজ্জ্বল
ইতিহাসের অংশ হয়ে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

এরূপ গগনচুম্বী অর্জন ঘটে ক্ষণজন্মা কোনো মানুষের হাত ধরে
এমনি একজন ক্ষণজন্মা, বাংলার মানুষের অতি আপনজন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার হাত ধরে স্বাধীন বাংলাদেশ
প্রতিষ্ঠিত হয়, বাঙালি পায় ঐতিহাসিক বিজয়-মানচিত্র-পতাকা
আর স্বশাসনে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্মাণের অমূল্য সনদ।

এই মহান নেতার সারা জীবনের সংগ্রাম, তিতিক্ষার পথ ধরে
তাঁরই ডাকে প্রাণপণ মুক্তিযুদ্ধে নামে, আর নয় মাস যুদ্ধ করেই
বিজয় কব্জা করে নেয় বাংলার স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ।

বঙ্গবন্ধুই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা পিতা
সেই ১৯৪৮ এবং ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে
নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে অনেক জেল-জুলুম সহ্য করে
তিনি এগিয়ে চলেন দৃঢ় মনোবলে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে
স্বাধীনতার-মুক্তির সংগ্রামকে সুসংহত ও বেগবান করার লক্ষ্যে।
১৯৭১-এর ৭ মার্চ-এ প্রদত্ত বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃত তাঁর ভাষণ
সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করে মহারণের তরে।

অতঃপর তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন এই ঘোষণা দেন ২৬ মার্চ ১৯৭১
সেই থেকে বিজয়ের হাতছানি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা যোগায়
এবং ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর গর্জে ওঠে কাঙ্খিত বিজয়ডঙ্কা
স্বাধীন বাংলাদেশ, স্বাধীন বাঙালি, ঋজু মেরুদন্ড, উঁচু মাথা।

২০২০ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মের একশত বছর পূর্তি
এক অনির্বচনীয় জাতীয় উৎসবের উৎসমুখ, আর অবশ্যই
তাঁর জীবন জাতির জন্য এক বিরল গর্বের শিখা অনির্বাণ।

গভীর শ্রদ্ধা তাঁর স্মৃতির প্রতি এবং প্রার্থনা আল্লাহ তা'লার কাছে
তাঁকে যেন অপার করুণায় ঠাঁই দেয়া হয় জান্নাতুল ফেরদৌসে।

-১৮ মার্চ ২০১৯

বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে পত পত

-কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

বাংলাদেশ আমার গর্ব আমার ধ্যান
আমার ঠিকানা
বাংলাদেশের পতাকা লাল সবুজ
উড়ছে আজ বিশ্ব দরবারে পতপত
সম্মানে সমীহে সবখানে।

জন্ম নিলো এ দেশটি ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ
বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায়
মুক্ত করা হলো মুক্তিযুদ্ধে ২৬৫ দিন পর
ওরা বললো তলাবিহীন ঝুড়ি এ যে
বাঁচবে না বেশি দিন।

তারা হয়ত শুনে নাই অথবা আমলে নেয় নাই
বঙ্গবন্ধুর সেই প্রত্যয়ী ঘোষণা
৭ই মার্চের ভাষণে
'সাতকোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না
..... কেউ আমাদের দমাতে পারবে না'।

সকল বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ আজ
সারা বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল
দৃপ্তপদে এগিয়ে চলা এ দেশে লক্ষ্য মোদের
দ্রুত গড়ে তোলা সবার ন্যায্য অংশগ্রহণে আর উন্নয়নে
সুখ শান্তিতে ভরা উন্নত সোনার বাংলা।

বাংলাদেশের পতাকা লাল সবুজ
উড়ছে আজ বিশ্ব দরবারে পতপত
সম্মানে সমীহে সবখানে।

-২৯ জানুয়ারী ২০১৯

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন স্মৃতিকথন

স্মৃতিকথন-১

সংস্থার নাম: আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আফসার উদ্দিন খান

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের মহান নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার এলাকায় এলাকায় জনসাধারণ সংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক বিভিন্ন বাহিনী গঠন করে। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে গঠিত এরূপ একটি বাহিনীর নাম আফসার বাহিনী। ২৫শে জুন ১৯৭১ সালে রোজ শুক্রবার ঐতিহাসিক ভাওলিয়া বাজারে পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের আফসার বাহিনীর ৪৮ ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। মল্লিকবাড়ীর বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মান্নান পাকবাহিনীর গুলিতে ২৬শে জুন শহিদ হয়। রক্তক্ষয়ী সে যুদ্ধে পাকবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯ জুলাই ১৯৭১ সালে সিড স্টোর বাজারে পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ৮ জন পাক সেনা মারা যায়। ১২ নভেম্বর ভালুকা থানার অন্তর্গত মামুদপুর চান্দর হাটি গ্রামে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে পাড়াগাঁও গ্রামের ডাঃ শমসের শহিদ হন। একই দিনে কাইচাঁন গ্রামের ৮৪ জন নারী-পুরুষকে পাকবাহিনী হত্যা করে। পাকবাহিনীর অত্যাচার চলতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় পাকবাহিনীর সেনারা আমাদের এলাকার প্রায় দুইশত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলো। অবশেষে ৭ ডিসেম্বর আমাদের আফসার বাহিনীর আক্রমণে পাকবাহিনী ভালুকা ছেড়ে গফরগাঁও থানায় পলায়ন করতে বাধ্য হয় এবং ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে ভালুকা থানা পাকবাহিনী মুক্ত হয়।

স্মৃতিকথন-২

সংস্থার নাম: ডাক দিয়ে যাই

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কলাখালী, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ মন্নান হাওলাদার

আমি আঃ মন্নান হাওলাদার পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন কলাখালী ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি মেজর আব্দুল জলিল-এর অধীন ৯নং সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এ সময়ে আমরা বিভিন্ন রকমের অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হই। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে খুলনার রেডিও স্টেশন এলাকা দখলমুক্ত করা। আমি সর্ব প্রথম সাতক্ষীরা জেলায় যুদ্ধ করি। যুদ্ধ চলাকালীন নির্দেশ আসে খুলনার রেডিও স্টেশন এলাকা দখল করতে হবে। সাতক্ষীরা জেলাকে শত্রুমুক্ত করতে খুলনার রেডিও স্টেশন এলাকা আক্রমণ করি। পাকবাহিনীর সাথে আমাদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। পাকবাহিনীর ভারী অস্ত্রের বিপরীতে আমাদের সমরাস্ত্র অত্যন্ত নগণ্য হলেও আমাদের মানসিক শক্তি ও অনুপ্রেরণা তাদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি ছিলো। পাকবাহিনীকে বধ করার কৌশল নিয়ে আমরা ভাবতে থাকি। অবশেষে কৌশল হিসাবে রাতের আঁধারে আমরা সারি সারি কলাগাছ পুঁতে সেখানে দুই একটা ফায়ার করি। পাকবাহিনীরা রাতের আঁধারে গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে যায় এবং কলা গাছের সারিকে মুক্তি বাহিনীর দল ভেবে অবিরাম গুলি চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে পাকবাহিনীর গোলা-বারুদ শেষ হয়ে এলে আমরা হামলা চালাই এবং ৩০ জন পাক সৈন্য আমাদের হাতে নিহত হয়। এই অবস্থায়, পাক সৈন্যরা পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং আমরা খুলনার রেডিও স্টেশন এলাকা শত্রুমুক্ত করি। আমাদের সহযোদ্ধা অনেকে আহত হয়। সেদিনের ঘটনা আমাকে এখনো শিহরিত করে।

স্মৃতিকথন-৩

সংস্থার নাম: ডাক দিয়ে যাই

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: শিকদারমল্লিক, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ কুমার রায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো একটি সর্বজনীন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সবাই অংশগ্রহণ করে। আমি সন্তোষ কুমার রায় মুক্তিযুদ্ধের সময় ৯নং সেক্টরে মেজর জলিল-এর অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিভিন্ন বিচিত্র ও প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখীন হই। মুক্তিযুদ্ধকালীন আমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, বামনা থানার বদনীখালী যুদ্ধ ও বামনা থানা দখলমুক্ত করা। ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে আমি বাংলাদেশে চলে আসি এবং তৎকালীন পটুয়াখালী জেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের দল গঠনে তৎপর হই। বেতাগী থানার সরিষামুড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুখরতন বাবুর বাড়িতে বসে জানতে পারলাম আগামী দিন সকালবেলা গানবোট যোগে পাকবাহিনী বদনীখালী বাজার আক্রমণ করবে। তাই ভোরবেলায় ১টি নৌকা যোগে আমরা মাত্র ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা উক্ত বাজারে অবস্থান নেই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকবাহিনীর গান বোটের শব্দ শুনতে পাই। আমরা তাৎক্ষণিক নদীর পাড়ে যার যার অবস্থান নেই। পাকবাহিনীর বোট বাজারের কাছাকাছি আসলে আমরা মাত্র এক রাউন্ড গুলি করি। এরপর পাকবাহিনী তাদের বোট বদনীখালী বাজার ঘাটে ভিড়ালে আমরা খালের দুই তীর থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করি। পাকবাহিনী ওয়্যারলেস যোগে অন্য স্টেশনে যোগাযোগ করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও দুটি গানবোট চলে আসে এবং শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বন্দুক যুদ্ধ। যুদ্ধে পাকবাহিনীর একটি গানবোট পানিতে তলিয়ে যায়। এক পর্যায়ে আমাদের বুলেট ফুরিয়ে গেলে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই। পাকবাহিনীর হাতে আমাদের দুই জন মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়ে। একজনকে তারা সাথে সাথে গলা কেটে হত্যা করে এবং অন্যজনকে তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে একটি চোখ উপড়ে ফেলে। পাকবাহিনী বদনীখালী বাজারে অগ্নিসংযোগ করে চলে যায়। আমাদের ঐদিনের যুদ্ধে এলাকায় ব্যাপক ভীতির সঞ্চার হয়। বদনীখালী বাজার

পুড়িয়ে দিয়ে পাকবাহিনী আশ্রয় নেয় বিষখালী নদীর পশ্চিম পাড়ে বামনা থানায়। কিছুদিনের মধ্যে আমরা আবার সংগঠিত হয়ে বামনা থানা আক্রমণ করি এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকবাহিনীকে পিছু হটিয়ে বামনা থানা শত্রুর দখল মুক্ত করি।

স্মৃতিকথন-৪

সংস্থার নাম: ডাক দিয়ে যাই

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: দূর্গাপুর, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমির হোসেন

আমি মোঃ আমির হোসেন মুক্তিযুদ্ধের সময় সুন্দরবন এলাকায় ৯নং সেক্টরের অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ১৩ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে আমাকে গেজেটভুক্ত করে। আমার মুক্তিযোদ্ধা সনদ নং- ম ৬৭৫০৬। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। শিবসা, রায়মঙ্গল ও মোয়াজ্জোদ এই তিন নদীর মোহনায় একটি আমেরিকান ঘাঁটি ছিলো। আমরা নৌকায় করে সেখানে গেলে পাকসেনারা দূরবীণ দিয়ে আমাদের অনেকগুলো নৌকা দেখতে পায়। তারপর ওরা গানবোট দিয়ে আমাদের পেছনে ধাওয়া করে। গানবোট আমাদের ধাওয়া করছে সেটা বুঝতে পেরে আমাদের কমান্ডার কিনারে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক আমরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান নিই এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রু সেনারা আমাদের কাছাকাছি পৌঁছালে যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে আমাদের সহযোদ্ধারা মর্টার শেলের মাধ্যমে হানাদারদের একটি গানবোট ধ্বংস করতে সক্ষম হয় এবং অন্য দুটি বোট পিছু হটতে বাধ্য হয়। সেদিনের ঘটনায় আমি এখনও শিহরিত হই।

স্মৃতিকথন-৫

সংস্থার নামঃ ডাক দিয়ে যাই

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ টোনা, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সৈয়দ আলী শেখ

আমি সৈয়দ আলী শেখ পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন টোনা ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা। দেশ, মাটি ও মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে আমি ভারতে প্রশিক্ষণ নেই। দেশে ফিরে ৯নং সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আমার মনে পড়ে পিরোজপুরকে শত্রুমুক্ত করার ঘটনা। পিরোজপুরের রায়ের কাঠীতে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। তখন পাকিস্তানী বাহিনী তেজদাসকাঠী বধ্যভূমিতে ১৪ জন বাঙালিকে হত্যা করে। তাদের মধ্যে একজন ফারুক হোসেন। ফারুক হোসেনের মাথায় পতাকার স্ট্যান্ড বসিয়ে হানাদাররা পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে জোর করে। কিন্তু ফারুক হোসেন জয় বাংলা ধ্বনি দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করেন। অপরদিকে পাকবাহিনীকে প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রস্তুত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। সকল থানা, বাজার এমনকি গ্রামে পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। পিরোজপুর শহর ১,৪০০ জন মুক্তিযোদ্ধার দখলে ছিলো। এভাবে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে ৭ই ডিসেম্বর পিরোজপুর শত্রুমুক্ত হয়।

স্মৃতিকথন-৬

সংস্থার নামঃ রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ কুশলী, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ ছালেক মোল্লা

বাঙালি জাতীয় জীবনে মহান মুক্তিযুদ্ধ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারি ও আমলা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিলো। আমি আঃ ছালেক মোল্লা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া

উপজেলাধীন কুশলী ইউনিয়নের বাসিন্দা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি মূলত যশোর ও এর আশেপাশের এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে আমার স্মৃতিতে বার বার ফিরে আসে যে ঘটনা তা হলো- ভারতের বীরভূম থেকে ২৮ দিনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে আমরা এসপি বাদশা মিয়ার নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ জন মুক্তিযোদ্ধা যশোরের আড়পাড়া এলাকায় পৌঁছাই। সেখানে আগে থেকে ওত পেতে থাকা রাজাকার ও পাকিস্তানি সৈনিকদের সাথে আমাদের এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের সহযোদ্ধা প্রায় ৪০/৪৫ জন শাহাদাৎ বরণ করেন এবং প্রায় ২৫০ জনেরও অধিক পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার নিহত হয়।

স্মৃতিকথন-৭

সংস্থার নাম: রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: রাঢ়ীখাল, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু নেছার ভূঁইয়া

আমি আবু নেছার ভূঁইয়া, একজন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আমার মুক্তিযোদ্ধা সনদ নং- ২১২২৯। মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে মিশ্র অনুভূতির একটি ঘটনা আমার মনে দাগ কেটে আছে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের এক মাস আগে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর একটি দল অস্ত্র নিয়ে নৌকা যোগে শ্রীনগর থেকে লৌহজং যায়। গোপন সূত্রে আমরা এই খবর আগেই পেয়ে যাই এবং সদলবলে সেখানে গিয়ে তাদেরকে ঘিরে ফেলি। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা কোন পাল্টা আক্রমণ করার সাহস পায়নি। বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্রসহ এরকম একটি দলকে বন্দী করা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি ব্যাপার ছিলো। আবার এই দলটি আমাদের হেফাজতে থাকা অবস্থায় সাধারণ জনতার আক্রোশের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে তারা গণপিটুনির শিকার হলে তাদের আমরা রক্ষা করতে ব্যর্থ হই। এই ঘটনাটি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের জন্য দুঃখজনক ছিলো।

স্মৃতিকথন-৮

সংস্থার নাম: রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কদমতলা, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা আশ্রাব আলী মোল্লা

আমি আশ্রাব আলী মোল্লা, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ৯নং সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ. জলিল-এর অধীনে যুদ্ধ করি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের নানা ঘটনা আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এর মধ্যে একটি ঘটনা আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা সুন্দরবনে অবস্থান করি। হঠাৎ একদিন দুপুর একটার সময় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে দুইটি হেলিকপ্টার উড়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পরেই পাকহানাদার বাহিনী দুইটি যুদ্ধ বিমান থেকে বৃষ্টির মত আমাদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। আমরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বনের পশুপাখির সাথে ছোটাছুটি করে সুন্দরবনের আরো গভীরে গিয়ে গাছের নিচে লুকিয়ে পড়ি। এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হামলা করবো। পরিকল্পনা মোতাবেক হানাদারদের ট্যাংকার ধ্বংস করার জন্য আমরা শরণখোলা আসি। আমরা দলে ছিলাম ৭০-৮০ জন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা তাদের ট্যাংকারে হামলা করি। শীতের রাতে প্রায় ৩-৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমরা ট্যাংকার ধ্বংস করতে সফল হই। এই যুদ্ধে আমাদের একজন সহযোদ্ধা শহিদ হন। অপরদিকে পাকিস্তানিদের ৪০-৫০ জন সেনা নিহত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংকার এর ওপর উঠে আমরা বাংলাদেশের পতাকা ওড়াই।

স্মৃতিকথন-৯

সংস্থার নাম: রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বালিগাঁও, টঙ্গিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা

আমি মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা, মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি উপজেলার বালিগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধকালীন আমার বয়স ছিলো প্রায় ১৬-১৭ বছর।

আমি ১৯৭১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত হই। সেই ভাষণ, বজ্র কণ্ঠস্বর আর জনতার উত্তাল ঢেউ আজো যেন চোখ বুজলেই দেখতে পাই। সেদিনই মনস্থির করি দেশের জন্য প্রয়োজন হলে জীবন বাজি রাখবো। ২৫শে মার্চ রাতে পাক হানাদাররা বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড চালায়। ক্রমেই সারাদেশে তারা হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে। মুন্সীগঞ্জও এর বাইরে ছিলো না। জুলাই মাসের দিকে আমার এক বড় ভাই, মোতালেব, যিনি এদেশের মুক্তির জন্য তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতেন, তাঁকে পাকিস্তানিদের এদেশের দালাল রাজাকার সালাম, মন্টু মিয়াসহ কয়েকজন মিলে হত্যা করে। একই সাথে খুঁজতে থাকে তার সহচরদের। এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে বালিগাঁওয়ের চাঁন মিয়া খান ও ২টি হিন্দু পরিবারের সহযোগিতায় নুরুল ইসলামসহ আমরা কয়েকজন আগস্টের শেষ দিকে মেঘনা পাড়ি দিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টেনমেন্টের পাশ ঘেঁষে নৌকায় করে আগরতলা চলে যাই। এ্যাডভোকেট শামসুল হকের নেতৃত্বে বকুলনগর ক্যাম্পে যুক্ত হই। সেখান থেকে আমাকে পদ্মা ক্যাম্পে দেওয়া হয়। দীর্ঘ দুই মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মোফাজ্জেল হোসেন কমান্ডারের নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। গভীর রাতে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে নৌকায় করে মেঘনা পাড়ি দিয়ে আমরা মুন্সীগঞ্জে প্রবেশ করি। সেই রাতেই তালতলা হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বালিগাঁও প্রবেশ করি। আমাদের ওপর দায়িত্ব পড়ে মোক্তারপুরের পাকহানাদার ক্যাম্প আক্রমণ করা। আনুমানিক ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে আমিসহ প্রায় ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল রাত ১২টায় মোক্তারপুর পাক হানাদার ক্যাম্প আক্রমণ করি। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। ১০০-১৫০ জন পাক হানাদারের সাথে মাত্র ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ বেশিক্ষণ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এক ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর আমরা মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হলাম। কিন্তু আমাদের কমান্ডার মোফাজ্জেল হোসেনকে হানাদাররা ঘিরে ফেলে। তিনি মণ্ডল বাড়ির পুকুরের কাঁচা পায়খানার পানির নিচে একদিন লুকিয়ে ছিলেন। একদিন পর তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। যুদ্ধ জয় করতে না পারলেও আমরা সেদিন তাদের রসদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হই। ১৩ তারিখের দিকে যৌথ বাহিনী ঢাকায় ব্যাপক আক্রমণ শুরু

করলে পাক হানাদাররা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। মূলত সেদিন থেকেই মুন্সীগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। ১৬ তারিখে পাক হানাদাররা আত্মসমর্পণ করলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা লঞ্চে করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই।

দেশের জন্য যুদ্ধে অংশ নিতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার একটাই উদ্দেশ্য ছিলো, দেশ স্বাধীন হোক, দেশের মানুষ মুক্ত হোক এবং দেশ সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী হোক। আমরা যেন স্বাধীনভাবে নিজেদের অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারি।

এখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি দেশের ক্ষমতায় রয়েছে, এজন্য আমরা অত্যন্ত খুশি। তিনি আমাদের জন্য বাড়ি, চাকুরি ও ভাতার ব্যবস্থা করেছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মহোদয়ের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আরো কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আর্জি পেশ করলাম। পদক্ষেপগুলো এরকম হতে পারে-গরীব মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আর্থিক সহায়তা, স্বল্প সুদে ঋণ, আলাদা স্বাস্থ্যসেবা, আমাদের অংশগ্রহণে জাতীয় দিবস পালন প্রভৃতি।

স্মৃতিকথন-১০

সংস্থার নামঃ রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ আড়িয়ল, টঙ্গিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার (অবঃ) আবদুল আজিজ খান

আমি আবদুল আজিজ খান ৩নং সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর কে এম শফি উল্লাহ-এর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। স্বাধীনতাযুদ্ধের অসংখ্য স্মৃতির মধ্যে শেষ ১২ দিনের স্মৃতিচারণ করছি। আমরা ১১ ইস্ট বেঙ্গল ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ধর্মগড়, মুকুন্দপুর, হরষপুর দখলে এনে সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বরাবর অবস্থান নিয়ে এই সড়ক অবরোধ করি। বি কোম্পানিকে নির্দেশ দেয়া হয় সড়ক অবরোধ করে রাখার জন্য। আমাদের পুরো দল সড়কে পৌঁছানোর আগেই পাকিস্তান আর্মির সৈন্য বোঝাই তিনটি গাড়ি আমাদের

পজিশনের ভেতর ঢুকে পড়ে। আমরা দুইটি গাড়ির ওপর ফায়ার করি, যার ফলে গাড়িগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাকসেনাদের মধ্যে কিছু আহত, কিছু নিহত হয় এবং কিছু পালিয়ে যায়।

পাকিস্তানি বাহিনীর এই তিনটি গাড়ির সাথে যুদ্ধে আমাদের সম্মুখভাগে ছিলো এ, সি এবং ডি কোম্পানি। এর মধ্যে সি কোম্পানির সাথে থাকা আমাদের কমান্ডার মেজর নাসিম পেটে গুলি লেগে মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে তাকে আগরতলা পাঠানো হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য। আমাদের আরো কিছু সহযোদ্ধা হতাহত হন। এই যুদ্ধে শাহাবাজপুর ব্রিজ (ইসলামপুর) এলাকা মুক্ত হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমরা পক্স হোল (বিশেষ ধরনের বাংকার) তৈরি করলাম এবং প্রচণ্ড শীতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় সেখানেই রাত কাটালাম।

৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে মেজর মতিন সাহেব ১১ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক হিসাবে যোগদান করেন অর্থাৎ মেজর নাসিম সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হন। ৮ ডিসেম্বর শাহাবাজপুর এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। আমরা সরাইলের দিকে অভিযান অব্যাহত রাখি। মাঝে মাঝে পাকিস্তান আর্মির সাথে সংঘর্ষ বাধলে ওরা আমাদের ওপর ৩/৪ ইঞ্চি মর্টার দ্বারা শেলিং করতে থাকে। নাওয়া-খাওয়া নেই, সবসময় যেন মৃত্যুকে মুঠোয় নিয়ে লড়ে যাওয়া। সরাইল রাস্তার মোড়ে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে সরাইল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। সাধারণ জনগণ আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো। তারা দেখলো শত শত মুক্তি বাহিনী পোশাক পরা অবস্থায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক গ্রুপ পিছু হটলে আরেক গ্রুপ কাভার হিসেবে যুদ্ধ করতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো এভাবেই ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আশুগঞ্জে একত্র হওয়া। আমরাও তাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ বজায় রাখি। সরাইলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছে এমন দুই জন অফিসারকে বন্দি করা হয়। আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে গোলাবারুদ ও অস্ত্র পাচ্ছিলাম। ফলে গোলাবারুদের ঘাটতি ছিলোনা। তবে খাবারের ঘাটতি প্রকট ছিলো। খাবার রান্না হলেও পাকিস্তান আর্মি তালশহর, দূর্গাপুর, পানিস্বর গ্রামের ওপর বোমা বর্ষণ করায় খাবার সরবরাহকারীরা আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারছিলো না। তাদের বোমাবর্ষণের কারণে আমরাও ঝুঁকিতে পড়ে যাই কারণ তখন আমরা বাংকার করিনি। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে পাকিস্তান আর্মির কুমিল্লা অঞ্চলের সৈন্য এবং সিলেট অঞ্চলের সৈন্যরা আশুগঞ্জে জমা

হতে থাকে। তাদের সাঁজোয়া যান, ট্যাংক, কামানসহ সকল যুদ্ধসরঞ্জাম আশুগঞ্জে নিয়ে আসে।

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো এবং ভারতীয় ট্যাংক আসলো। কামান, ৩/৪ ইঞ্চি মর্টার এসব আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পেলো এবং মনোবলও বাড়লো। এরপরই আদেশ হলো আশুগঞ্জ আক্রমণ করার জন্য। ভারতীয় বাহিনী রেল লাইনের দুই পাশে শত্রু সোজা মাঝখানে থাকবে, ২য় ইস্ট বেঙ্গল থাকবে দক্ষিণ পাশে এবং ১১ ইস্ট বেঙ্গল থাকবে উত্তর পাশে। আমাদের সাথে ট্যাংক থাকবে এবং পিছন থেকে কামানের সমর্থন পাওয়া যাবে। আমরা অগ্রসর হতে শুরু করলে আশুগঞ্জ থেকে ১০০-১৫০ গজ দূরে থাকতেই পাকিস্তান আর্মি আমাদের ওপর ফায়ারিং শুরু করে।

অবস্থানগতভাবে আমরা সুবিধা করতে পারছিলাম না, কারণ পাকবাহিনী বাংকারে অবস্থান করছিলো। তাছাড়া তাদের অবস্থানের আশেপাশে প্রচুর গাছপালা ছিলো। অপরদিকে আমরা যেখান থেকে যুদ্ধ করছিলাম সেগুলো ছিলো খোলা ধানের জমি এবং রেললাইন। আমাদের হাতে বাংকার খোঁড়ার সময় ছিলো না। উপরন্তু, ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে তারা আমাদের ১০-১৫টি ট্যাংক ধ্বংস করে দেয়। এই পর্যায়ে আমাদের বেশকিছু সহযোদ্ধা (ভারতীয় সৈন্যসহ) শহিদ ও আহত হলে আমরা পিছু হটতে থাকি। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের অবস্থান থেকে উঠে এসে আমাদেরকে ধাওয়া করতে থাকে।

এই প্রথম ভারত থেকে যুদ্ধবিমান এসে তাদের অবস্থানের ওপর বোমা বর্ষণ শুরু করে। তিনবার বিমান হামলা করা হয় ফলে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে। পুরো রণাঙ্গন জুড়ে লাশ আর লাশ। পাকিস্তানি ট্যাংকগুলোও এই পর্যায়ে বিমান হামলায় পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই যুদ্ধে। রাতে আমরা দূর্গাপুর অবস্থান নিয়ে রাত কাটিয়েছিলাম।

১০ ডিসেম্বর সকাল থেকে ভারতীয় হেলিকপ্টারে করে আমাদের সহযোদ্ধাদের লাশগুলো সরিয়ে নেয়া হয়। যুদ্ধের এই পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর ২য় ইস্ট বেঙ্গল এবং ভারতীয় বাহিনীর একাংশ আশুগঞ্জ ও ভৈরবকে পাশ কাটিয়ে লায়ালপুর দিয়ে নরসিংদীর রায়পুরা-মেথিকান্দা এলাকায় চলে আসে। আশুগঞ্জ এবং

ভৈরবের মাঝে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। অপরদিকে ১১ ইস্ট বেঙ্গল ও ভারতীয় বাহিনীর আরেকটি অংশ পেছনে থেকে যায় আশুগঞ্জ ও ভৈরব দখল করার জন্য। সারাদিন ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা করে বেশ কয়েকবার। আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে জানতে পারি তারা ভৈরবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আশুগঞ্জে সৈন্য সংখ্যা তখন কম। সেইদিন তারা ভৈরব ব্রিজের তিনটি স্প্যান উড়িয়ে দেয়। আমরা আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে থাকি।

অবশেষে আদেশ আসে ১১ ডিসেম্বর ভোরে আশুগঞ্জ দখল করতে হবে। স্থল আক্রমণের সাথে আমরা ভারতীয় বিমান বাহিনীর সহযোগিতা পাই। দুপুর নাগাদ আশুগঞ্জ আমাদের দখলে আসে এবং পাকিস্তানি বাহিনী ভৈরব চলে যায়। আমাদের বি-কোম্পানির অবস্থান হয় আশুগঞ্জ বিশ্ব খাদ্য গোডাউনের দক্ষিণ পাশে। খাদ্য গুদামের সুউচ্চ অট্টালিকা দুইপক্ষের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো এবং এই এলাকার সকল বেসামরিক লোকজন অন্যত্র সরে গিয়েছিলো। আমাদের সামনে ছিলো মেঘনা নদী এবং নদীর ওপারে ভৈরববাজার। বিভিন্ন কোম্পানি এবং ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার হিসেবে আমাদের সাথে ছিলেন ক্যাপ্টেন নজরুল, ক্যাপ্টেন নাসির, মেজর সুবেদ আলী ভূঁইয়া এবং মেজর মতিন সাহেব। পাকিস্তানি আর্মি আমাদের ওপর মর্টার শেলিং করে আমরাও শেলিং করি। পাশাপাশি ভারতীয় যুদ্ধ বিমানগুলো পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানগুলোতে অনবরত বোমা বর্ষণ চালিয়ে যায়। সেদিন বিকেলে একটি হালকা বিমান আমাদের মাথার ওপর খুব নিচু হয়ে উড়ে গেলো। বিমান থেকে রুটি এবং হালুয়ার কৌটা ফেলা হলো। প্রায় ১২-১৩ দিন কাপড় পাল্টানো কিংবা গোসল করার সুযোগ পাইনি। এতোদিন টানা জুতা পরে থাকার কারণে পা সাদা হয়ে ফুলে গিয়েছিলো এবং প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বের হচ্ছিলো।

১২ ডিসেম্বর সকাল থেকেই ভারতীয় বিমানবাহিনী ভৈরবে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর বিমান হামলা শুরু করলো। রাত-দিন গোলাগুলির মধ্যে জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ি। প্রায় ন'মাস পরিবারের কারো সাথে দেখা নেই। হঠাৎ মাকে দেখার জন্য প্রচণ্ড আকুতি জাগে। যাই হোক, ১১ ইস্ট বেঙ্গলকে আশুগঞ্জ রেখে ভারতীয় বাহিনী ঢাকার দিকে রওনা করে। আমাদের কাজ হলো ভৈরবে আটকা পড়া পাকিস্তানি বাহিনীর

সদস্যদেরকে ব্যস্ত রাখা এবং তাদের ঢাকা অভিমুখী যেকোন যাত্রা প্রচেষ্টা রুখে দেয়া।

১৩ ডিসেম্বর সকাল থেকে আবার ভৈরবের ওপর বিমান হামলা শুরু হলো। পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর বিমান হামলা হলেই ওদের মর্টারগুলো গর্জে উঠতো। বিমান বিধ্বংসী কোন ব্যাটারি বা সমরাস্ত্র তাদের কাছে না থাকায় তারা বিমান হামলার জবাব হিসেবে আমাদের ওপর পাল্টা মর্টার হামলা চালাতো। আমাদের অধিনায়ক মেজর মতিন সাহেব, বি কোম্পানির কমান্ডার মেজর সুবেদ আলী ভূঁইয়া, ক্যাপ্টেন নাসির এবং ক্যাপ্টেন নজরুল সবসময় ব্যক্তিগতভাবে আমাদের খোঁজ রেখেছেন। এছাড়া আমার বাকি সহযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন সুবেদার মান্নান, নায়েব সুবেদার আরশাদ, হাবিলদার মেজর মালেক, নায়েক চাঁন মিয়া, নায়েক হান্নান, ল্যান্স নায়েক ইছহাক, সিপাহী ভুলু, কাসেম, জুলফু, তাহের, জামাল ও আরো অনেকে।

১৪ ডিসেম্বর শীতের সকাল। শীতবস্ত্র নেই, গায়ে একটি মাত্র পোশাক পরা। সাথে ছিলো গোলা বারুদ, গ্রেনেড, গাঁইতি, বেলচা এগুলো। যথারীতি সকালেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর চারটি বিমান থেকে হামলা শুরু হলো। জবাবে পাকিস্তান বাহিনী তখনো মর্টার হামলা চালিয়ে গেলো। ভৈরব বাজারের ওপর বিমান থেকে লিফলেট ফেলা হলো আত্মসমর্পণের আহ্বান নিয়ে।

১৫ ডিসেম্বর সারাদিন উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি ও শেল বিনিময় হলো। তারা সর্বশক্তি দিয়ে শেলিং ও ফায়ারিং করতে লাগলো। আমরা বিভিন্ন সূত্রে জেনেছিলাম ভৈরবে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর লোকবল ছিলো আনুমানিক দেড় হাজার। তবে আমাদের এই ধারণা ভুল ছিলো। সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী কোণঠাসা অবস্থায় ছিলো এবং দেশের অনেকগুলো এলাকা শত্রুমুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আশুগঞ্জের যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ভৈরবে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতিরোধ দেখে আমাদের মনে তখনো বিজয় কখন আসবে এটা নিয়ে সংশয় ছিলো। অন্যদিকে পাকিস্তানের সমর্থনে আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে প্রায় চলে এসেছে এই গুজবটিও আমাদের মধ্যে হতাশার জন্ম দিয়েছিলো।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। আমরা যথারীতি সকালবেলা ফায়ারিং করলাম পাকিস্তানিদের লক্ষ্য করে। কিন্তু সেদিন আকাশে আর ভারতীয় যুদ্ধবিমানগুলোকে দেখা গেলোনা। এমনকি পাকিস্তানি অবস্থানগুলো থেকেও কোন পাল্টা জবাব আসেনি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম পাকিস্তানিদের ভৈরবের অবস্থানের ওপর সাদা পতাকা উড়ছে। রেডিও থেকে জানতে পারলাম পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। গতকাল পর্যন্ত যে বিজয় নিয়ে আমরা সংশয়ে ছিলাম, আজ হঠাৎ সে বিজয়ের খবরে আমাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়লো। এই অনুভূতির কোন তুলনা নেই।

স্মৃতিকথন-১১

সংস্থার নামঃ রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ শংকরপাশা, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাসার খান মন্টু

স্বাধীনতা শুধু একটি শব্দ নয়। এর সাথে যুক্ত অনেক আবেগ, স্মৃতি, বেদনা ও হাজারো ঘটনার প্রতিচ্ছবি। আমি আবুল বাশার খান মন্টু, সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল-এর অধীনে মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯নং সেক্টরে যুদ্ধ করি। মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি স্মৃতির কথা উপস্থাপন করছি। রায়ান্দা এলাকায় গোপন সূত্রে খোঁজ পাই যে, রাজাকারদের সাথে পাকিস্তানি সৈন্যরা দেখা করতে এসেছে। সূত্র অনুযায়ী সেই জায়গা আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মিলে ঘেরাও করি। প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়। এক পর্যায়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা পালিয়ে যায় এবং কিছু পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ি এবং তারা আমাকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তাদের হাতে প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতনের শিকার হই। প্রচণ্ড প্রহারে আমার একটি হাতের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। হাতটি এখন প্রায় বিকল এবং বাঁকা হয়ে আছে।

স্মৃতিকথন-১২

সংস্থার নাম: রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: শরিকতলা, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান আহ্মেদ

আমি ১৯৬৫ সালে আনসার বাহিনীতে যোগ দিই। ১৯৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আমরা আনসার বাহিনী থানাগুলো রক্ষার দায়িত্বে ছিলাম। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় খুলনার দ্য ক্রিসেন্ট জুট মিলে চাকরিরত ছিলাম। এসময় খুলনা সোসাইটি সিনেমা হলের দক্ষিণ পাশের মাঠে ৬ দফা আন্দোলনের দাবী বাস্তবায়নে এক সভায় যোগ দেই। সভার শেষ দিকে পুলিশ আমাদের শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি বেলায়েত হোসেন পশারীসহ আমাদের ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে জেলে দেয়। পরের দিন বেলায়েতকে রেখে আমাদের ছেড়ে দেয়। পরবর্তীকালে আমাদের কঠোর আন্দোলনে শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি বেলায়েতকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হয় এবং আওয়ামী লীগ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত সকল রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করি।

আমাদের শ্লোগান ছিলো-

তোমার আমার ঠিকানা,
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
রাজধানী কোথায়?
ঢাকা না পিন্ডি
ঢাকা, ঢাকা।

নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ২৫ মার্চের নৃশংস হামলার পর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিই। এনায়েত হোসেন খাঁন ও ডা. আব্দুল হাই এমপি'র কাছে যাই। তারা আমাদেরকে ট্রেজারি থেকে অস্ত্র বের করে দেন। এরপর আমি ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর বীর বিক্রম এর নেতৃত্বে কাঠালিয়া, রাজাপুর, ঝালকাঠি,

নলছিটিতে খণ্ড খণ্ড গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এ সময় আমাকে ধরার জন্য আমার বাড়িতে বহুবার পাকবাহিনী হামলা চালায়। আমাকে না পেয়ে আমার মা, বাবা, স্ত্রীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। আমাদের বাড়ি লুণ্ঠন করে তারা রেডিও, ঘড়ি, টর্চ লাইট ও নগদ টাকা যা পায় তাই নিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য অপারেশনের মধ্যে আমার শেষ যুদ্ধের গল্প বলে শেষ করছি। যুদ্ধ স্থান বরিশাল ৩০নং খাদ্য গোডাউন। আমরা ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর বীর বিক্রম-এর নির্দেশে পাকহানাদার বাহিনীর আস্তানায় চারপাশ থেকে একযোগে আক্রমণ করি। ওরা কোন উপায়ান্তর না দেখে খাদ্য গোডাউনে আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা রান্না-বান্না করে খায়। ওমর সাহেব গোডাউন নির্মাণ প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করে পানির লাইনের তথ্য নেন এবং আমাদেরকে জানান। আমরা তখন মাটি খুঁড়ে পানির লাইন এবং বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করি। এতে হানাদার বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। এক সময় তারা আত্মসমর্পণ করে। কমান্ডারের নির্দেশ মোতাবেক আমরা তাদেরকে বেঁধে ট্রাকে তুলে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পাঠাই। এভাবে অসংখ্য আক্রমণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধে পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

স্মৃতিকথন-১৩

সংস্থার নামঃ গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ ফুলপুর, ময়মনসিংহ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাকীম সরকার

আমি মোঃ আব্দুল হাকীম সরকার, ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন ফুলপুর ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১১নং সেক্টরের অধীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হামিদুল্লাহ খান ছিলেন আমার সেক্টর কমান্ডার। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেক্টর কমান্ডারের অধীন অনেকগুলো অপারেশনে আমি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করি। একটি অপারেশনে আমরা ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার তেলিখালী নামক স্থানে পাকবাহিনীর দুর্ধর্ষ ঘাঁটিতে রাতের মধ্য প্রহরে মিত্র বাহিনীর সহযোগিতায় আক্রমণ করি। এই যুদ্ধে অনেকেই আহত হয় এবং আমাদের

১০ জন সহযোদ্ধা শাহাদাৎ বরণ করেন। প্রথমে আমার কোম্পানিকে পাকহানাদার বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব দিয়ে অধিক লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র অর্জনের জন্য অন্য কোম্পানি ভারতে চলে যায়। ভারত থেকে মিত্রবাহিনী ফিরে আসার আগেই হানাদার বাহিনী হালুয়াঘাট হতে ফায়ারিং শুরু করে। তখন আমার কোম্পানিও বাধ্য হয়ে ভারতে চলে যায়। পরবর্তীকালে মিত্রবাহিনীর সাথে ফিরে আমরা এই ঘাঁটিতে হামলা করি এবং পাকিস্তানি বাহিনী সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক হিসেবে অবসর গ্রহণ করি।

স্মৃতিকথন-১৪

সংস্থার নাম: সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বোদা, পঞ্চগড়

বীর মুক্তিযোদ্ধা জীতেন্দ্রনাথ দেব

আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আসামে মুজিব ক্যাম্পে যাই। দুই বছর বয়সী মেয়ে এবং মাত্র এক মাস বয়সী ছেলে রেখে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমার এক ভাই ও এক বোনের মৃত্যু হয়েছে। পরে আমার পরিবারকে জলপাইগুড়ির বাগান এলাকায় আমার এক মামার বাড়িতে পাঠাই। সেখানকার পঞ্চায়েত প্রধান একটি রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মুজিব ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ২৮ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল নিয়ে ঠাকুরগঞ্জ চিলাহাটি এবং দেবীগঞ্জ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যখনই লোকজন এসে খবর দিতো যে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামে ঢুকেছে, আমরা অপারেশনে বেরিয়ে পড়তাম। গোসল করার ব্যবস্থা ছিলো না, ঘুমানোর কোন জায়গা ছিলোনা। খাবারের সমস্যা তেমন হতো না, বাজারে বাজারে গিয়ে গামছা ধরে টাকা উত্তোলন করে খাবার জোগাড় করতাম।

এভাবেই নয় মাস পার হয়ে গিয়েছে। বিজয়ের পর গ্রামে এসে দেখি সব জায়গায় হাহাকার; খাদ্য নেই, মানুষ স্বজনহারা, বাড়িঘর পুড়ে ছারখার। আমাকে দেখে সবাই আমার কাছে দৌড়ে আসল। সবাই ঘিরে ধরে বলল

জীতেন এসেছে। অর্থাৎ জীতেন বেঁচে ফিরে এসেছে, কারণ ধারণা ছিলো হয়তো আমি মারা গিয়েছি। তবে আমার যে একটি কুঁড়েঘর ছিলো তা অক্ষত অবস্থায় ছিল। বর্তমানে আমার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে। অর্থাভাবে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করাতে পারিনি, তারা স্কুলের গণ্ডিও পার হয়নি। আমার মেয়েটি বিয়ে দেয়ার পর মারা গিয়েছে। তিন ছেলে দিন আনে দিন খায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা চালু করার জন্য এবং ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা না পেলে আমার দিন আরো সংকটাপন্ন হয়ে যেতো ।

স্মৃতিকথন-১৫

সংস্থার নাম: এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: নারিশা, দোহার, ঢাকা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রেজাউল করিম

আমি মোঃ রেজাউল করিম ২নং সেক্টরে মেজর হায়দারের অধীনে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ২৭ এপ্রিল ২০০৬ সালে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত হই। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আমার মুক্তিযোদ্ধা সনদ নং ম-১১৫৭৫২। যুদ্ধের সময় আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হতো। যেকোন সময় অপারেশনের ডাক পড়তো। কখন কোথা হতে ডাক আসে সেই সংবাদের অপেক্ষায় থাকতাম আমরা। মুক্তিযুদ্ধের অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। আমি দোহার থানার পোদ্দার বাড়ি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম। পাকবাহিনী হঠাৎ এসে দোহার থানার জয়পাড়া হাটে আক্রমণ করলো। পাকবাহিনী জয়পাড়া হাটে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। আমাদের কমান্ডার ছিলেন হাবিলদার সায়েদুর রহমান। তার নির্দেশে আমরা ক্ষণিকের প্রস্তুতিতে পাকবাহিনীকে আক্রমণ করি। আমাদের তৎপরতায় এক পর্যায়ে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

স্মৃতিকথন-১৬

সংস্থার নামঃ বাসা ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ রায়েদ, কাপাসিয়া, গাজীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সোলাইমান ভূঁইয়া

আমি মোঃ সোলাইমান ভূঁইয়া গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন রায়েদ ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা। ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশোনা শেষ করেছি। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মেজর কে এম শফিউল্লাহ-এর অধীনে যুদ্ধ করি। জনাব এজাজ আহমেদ ছিলেন আমাদের সাব সেক্টর কমান্ডার। আমি সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে কাপাসিয়া থানার সর্বত্র, মনোহরদী থানার একাংশে, পাকুন্দিয়া থানার সর্বত্র, হোসেনপুর থানার একাংশে, গফরগাঁও থানায় এবং শ্রীপুর থানায় যে সকল স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ছিলো সেই সকল স্থানে যুদ্ধ করেছি। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াও অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করেছি। সমস্ত যুদ্ধই দলীয়ভাবে করেছি। আমার মুক্তিযোদ্ধা সনদ নং ম-৯৩৭১০।

স্মৃতিকথন-১৭

সংস্থার নামঃ বাসা ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, কাপাসিয়া, গাজীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইসলাম

আমার নাম মোহাম্মদ ইসলাম। আমি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার দূর্গাপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলাদেশ থেকে ঘোড়াশাল জুট মিলের শ্রমিক নেতার নেতৃত্বে প্রথম দিন ৪টি নৌকা করে ৮০ জন ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলো। তখন ছিলো বর্ষাকাল। হানাদার বাহিনীর শেলিং-এ এই বহরের ৩টি নৌকাই ডুবে

যায়। এতে করে ৩টি নৌকার ৬০ জন লোক মারা যায়। অবশেষে একটি নৌকায় করে মাত্র ২০ জন লোক ভারতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় দিনে ঘোড়াশাল জুট মিল থেকে আমরা আবার ৮০ জন নরসিংদীর বেলাবো দিয়ে হেঁটে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বেলাবো ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাগণ জানালেন যেহেতু প্রথম দিন ৮০ জনের মধ্যে ৬০ জনকেই পাকবাহিনী হত্যা করেছে হাইকমান্ড থেকে নতুন মুক্তিযোদ্ধার কোনো দল পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা ক্যাম্প কমান্ডারের কাছে বন্ড সাইন করে জমা দিই যে পথিমধ্যে আমাদের মৃত্যুর জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী থাকবো। কমান্ডার আমাদের প্রত্যয় দেখে আর আটকে রাখলেন না এবং নৌকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরবর্তীকালে আমাদের ৮০ জনই ভারতে পৌঁছাতে সক্ষম হই। আমরা একরাত আগরতলা কংগ্রেস ভবনে অবস্থান করি। পরের দিন সকাল ১০ টায় আগরতলা থেকে আমাদের ৮০ জনকে ৪টি ট্রাকে করে পালাটানা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

৩ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে হেজামারা ক্যাম্প থেকে অস্ত্র নিয়ে কসবা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকি। আমি যুদ্ধ করেছি ২নং সেক্টরের আওতায় গাজীপুরের কাপাসিয়া থানায়। বিভিন্ন সময়ে ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ দিকে কালিগঞ্জ থানা, উত্তর দিকে কালিয়াকৈর থানা এবং পূর্ব দিকে কাপাসিয়া থানা আক্রমণ করেছি।

সবগুলো ঘটনার মধ্যে আমার বন্ধু ও সহযোদ্ধার কথা খুব মনে পড়ে। একটি অপারেশনে আমার একজন সহযোদ্ধা তার অবস্থান থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই একটি গুলি এসে তার বুকে লাগে। প্রায় সাথে সাথেই সে আমার চোখের সামনে শাহাদাৎ বরণ করে। অত্যন্ত সাহসী এবং শক্তিশালী হিসেবে সহযোদ্ধাদের মধ্যে তার সুনাম ছিলো। ভারতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় ২.৫ (আড়াই) মণ ওজনের একটি কমলার বস্তা সে নিজের মাথায় করে ২০-৩০ ফুট উঁচু-নিচু রাস্তা পার হয়ে হেডকোয়ার্টার থেকে ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। ক্যাম্প কমান্ডার খুশি হয়ে তাকে ১৬ হালি কমলা পুরস্কার হিসেবে দেন।

স্মৃতিকথন-১৮

সংস্থার নামঃ সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ ডৌয়াতলা, বামনা, বরগুনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহম্মেদ

১৯৭১ সালে আমার বয়স ১৯ বছর। জাফ্রাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে সে বছর এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ছিলাম। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেই সিদ্ধান্ত নিলাম দেশকে স্বাধীন করবো। সিদ্ধান্ত মোতাবেক মে মাসে আমি ঘর থেকে এক সের চাউল চুরি করে পাঁচ আনায় বিক্রি করে বুকাবুনিয়া সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টারে প্রশিক্ষণের জন্য উপস্থিত হই। দুই সপ্তাহ প্রশিক্ষণ শেষে বুকাবুনিয়া ক্যাম্পে অবস্থান করি। বিভিন্ন অপারেশনে টুআইসি সাহেবের সাথে বিভিন্ন স্থানে যাই। টুআইসি ছিলেন জনাব মোঃ জহির শাহ আলমগীর। সেপ্টেম্বর মাসে হাবিলদার কামাল-এর নেতৃত্বে আমাকে ডৌয়াতলা ক্যাম্পে পাঠানো হয়। ডৌয়াতলা ক্যাম্পে আমরা ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। ২৩ নভেম্বর ১৯৭১ হাবিলদার কামালের কাছে সংবাদ আসে আজ দিবাগত রাতে বামনা থানা আক্রমণ করা হবে। আমরা সবাই সন্ধ্যার পর বুকাবুনিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত আনুমানিক ১১টায় পৌঁছাই। সেখান থেকে রাত আনুমানিক ১২টায় বামনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বামনাতে আনুমানিক রাত ৩টায় পৌঁছাই। থানার পেছনে একটা খাল ছিলো। খালের এপাড়ে বাগানে বসে আমরা নিজেরা ৩টি উপদলে বিভক্ত হই। আনুমানিক রাত চারটার সময় থানা আক্রমণ করি। প্রায় দুই ঘণ্টা রাজাকারদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। ভোর প্রায় ৬টায় ল্যান্সনায়েক আমিরের নেতৃত্বে থানায় দুইটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। এরপরই রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করে। রাজাকারদের বেঁধে বুকাবুনিয়া নিয়ে আসা হয়। বিজয়ের পর জানুয়ারি মাসে আমি এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য স্কুলে যোগদান করি।

স্মৃতিকথন-১৯

সংস্থার নাম: সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: পাথরঘাটা, বরগুনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা এম.এ খালেক

আমি এম এ খালেক, বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলাধীন পাথরঘাটা ইউনিয়নের বাসিন্দা। সেনা সার্জেন্ট হিসেবে আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণ করি। আমার মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সাধারণ গেজেট নং-১০৮৯, যা ২২ নভেম্বর ২০০৫ সালে কার্যকর হয়। এছাড়াও মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আমার মুক্তিযোদ্ধা সনদ নং- ম-৬৯২৭২, যা ১৭ এপ্রিল ২০০৫ সাল হতে কার্যকর। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল-এর আওতাধীন ৯নং সেক্টরে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতি হৃদয়ে গেঁথে আছে। বামনা থানা আক্রমণ করে মুক্ত করার পর সদলবলে আমি ও আমার সাথে কয়েকজন সহযোদ্ধা থানার রুমে প্রবেশ করি। থানার একটি রুমে শত্রুপক্ষ দরজা বন্ধ করে লাইন পজিশন নিয়ে শুয়েছিলো। আমি দরজা ভেঙে প্রবেশ করলে তাদের একজন আমাকে গুলি করে। সৌভাগ্যবশত, গুলি লাগার আগেই তাকে ধরে ফেলতে সক্ষম হই।

স্মৃতিকথন-২০

সংস্থার নাম: পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি (পিপিএসএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মাচ্চর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা হালিম শেখ

আমি হালিম শেখ, ৮নং সেক্টরের অধীনে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈনিক হিসেবে অবসর গ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধকালীন অনেক স্মৃতি এখনো আমার কাছে স্পষ্ট। যুদ্ধকালীন তারিখ গুলো মনে নেই তবে মনে আছে রাজাকার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হওয়ার কিছু কিছু স্থান। আমরা প্রথমে খলিলপুর বাজার রাজাকার ক্যাম্প দখল করি। সারাদিন পরিকল্পনা করে আমরা রাতে সবাই মিলে রাজাকার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। রাজাকার বাহিনী তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। বারখাদা গ্রামের রাজাকার সোলেমান আমাদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়। তার কয়েক দিন পর কমান্ডার ইলিয়াসের নেতৃত্বে আমরা রাজবাড়ী কল্যাণপুর বিহারী ক্যাম্প দখল করার পরিকল্পনা করি। দুইদিনের যুদ্ধ শেষে আমরা তাদের পরাজিত করি। গোপালপুরে আমার তালঐ বাড়ি ছিলো। তাদের বাড়িতে ধানের গোলার ভেতরে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রেখে রাতের অন্ধকারে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করি। যা স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে আজও। আমার মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সাধারণ গেজেট নং-২০৫, যা ৫ জুন ২০০৫ হতে কার্যকর।

স্মৃতিকথন-২১

সংস্থার নাম: নিউ এরা ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: দুয়ারিয়া, লালপুর, নাটোর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রহমান

১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আমরা খবর পাই আটঘরিয়া থানায় পাকবাহিনী অবস্থান করছে। কমান্ডার আঃ হাই বাদশা-এর নেতৃত্বে আমরা আটঘরিয়া থানা অপারেশনের পরিকল্পনা করি। ফণি, আব্দুল হাইসহ আমরা ৮/১০ জন মুক্তিযোদ্ধা আটঘরিয়া থানা অভিমুখে অগ্রসর হই। পাকবাহিনী আমাদের অবস্থান টের পেয়ে এ্যামবুশ করলে কমান্ডার বাদশা ভাইয়ের নির্দেশে আমরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করি। এক সময় পাকবাহিনী পিছু হটে পাবনায় অবস্থান নেয়। সেখান থেকে তারা পুনরায় টেবুনিয়া ও আটঘরিয়ার বিভিন্ন গ্রামে অগ্নি সংযোগ শুরু করলে আমরা আটঘরিয়ার ফুলজান নদী পার হয়ে একদন্ত পৌঁছাই। এরপর আমরা পাবনা শহরের বাণী সিনেমা হলের কাছে বিশ্বাস গ্যারেজে অবস্থান করি। ইতোমধ্যে আমরা পাবনার ঈশ্বরদী থানার পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের একটি গার্ডার বোমার আঘাতে উড়ে যাওয়ার খবর জানতে পারি। বাড়ি ঘর পোড়ানোর দৃশ্য ও মানুষের আর্তনাদের কথা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। এরকম ছোট বড় অনেক যুদ্ধ করেছি। অনেক কষ্ট ও ত্যাগ তিতীক্ষার বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে হলেও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে পেরে আমি গর্ব বোধ করছি।

স্মৃতিকথন-২২

সংস্থার নাম: নিউ এরা ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ছলিমপুর, ঈশ্বরদী, নাটোর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জামাত আলী

১৯৭১ সাল, এপ্রিল মাস। পাকহানাদার বাহিনী পিজিসিবি দখল করে ঘাঁটি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে তারা রাজাকারদের সরবরাহকৃত তথ্য জানতে পারে যে চরমিরকামারী ও মিরকামারী গ্রামে অনেক মুক্তিবাহিনী আত্মগোপন

করে আছে। ১১ নভেম্বর ১৯৭১ সালে মিরকামারী গ্রামে রাতের অন্ধকারে পাক সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। সাব-সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সিরাজুল ইসলাম মন্টু ও আব্দুস সালাম সরদারের নেতৃত্বে সম্মুখ যুদ্ধে আমি, আব্দুর রহীম, আনিসুর রহমান পিন্টু, মতিয়ার রহমান ও আমাদের দলের আরো অনেকে অংশগ্রহণ করি। সেই সম্মুখ যুদ্ধে ৪ জন পাকহানাদার নিহত হয়। সে সময় পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজে বোমা মেরে একটি গার্ডার ভেঙে ফেলার খবর জানতে পারি।

১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ঈশ্বরদী-কুষ্টিয়া মহাসড়কের অগ্রভাগে আবার পাকহানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। উক্ত সম্মুখ যুদ্ধে আমি সরাসরি অংশগ্রহণ করি। এই যুদ্ধে আমাদের ৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন ও অনেক হানাদার বাহিনী নিহত হয়।

স্মৃতিকথন-২৩

সংস্থার নামঃ পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ জাফরাবাদ, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল রাজ্জাক

মুক্তিযুদ্ধকালীন আমার অনেক স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে অন্যতম হলো করিমগঞ্জ উপজেলাধীন বাইল্লাবাড়িতে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালানোর ঘটনা। কমান্ডার হাবিব ঠাকুরের নেতৃত্বে আমরা ৫৫ জন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে একত্র হই এবং বিভিন্ন উপদলে ভাগ হয়ে পরিকল্পনা মোতাবেক পাকহানাদার বাহিনীকে আক্রমণ করি। যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ জনগণের সহযোগিতা পেয়েছি, ভালোবাসা পেয়েছি। কিছুক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও রয়েছে। তেমনি একটি ঘটনার কথা বলছি। কনকনে শীতের রাত তখন প্রায় এগারোটা বাজে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আমি পাশের একটি খালে পড়ে যাই। আমার সহযোদ্ধারা সারা রাত ধরে যুদ্ধ করে। পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে পেরে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। আর আমি সারারাত সেখানেই পড়ে থাকি। খাল থেকে উঠে আসার মতো শারীরিক শক্তি আমার ছিলো না। সকাল ১০টার দিকে

একজনের সহায়তায় আমি খাল থেকে উঠে আসি এবং পাশের একটি বাড়িতে গিয়ে খাওয়ার জন্য এক গ্লাস পানি চাই। কিন্তু আমাকে তারা পানি না দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তখন বাড়ির আঙিনায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা একটি বদনার পানি পান করি এবং অসুস্থ শরীর নিয়ে কোনরকমে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্তানায় চলে যাই।

স্মৃতিকথন-২৪

সংস্থার নাম: পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: শিবপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল কাসেম

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে সিলেট জেলার জকিগঞ্জ এবং রশিদপুর এলাকায় আমি সেক্টর কমান্ডার মেজর চিত্তরঞ্জন দত্তের অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ছোট ছোট বেশ কয়েকটি অপারেশনেই আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লালটিলা নামক স্থানে সম্মুখ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেক্টর কমান্ডার সি আর দত্ত আহত হন। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জয়ী হয় এবং পাকিস্তানি বাহিনীর কিছু সদস্য নিহত হয় ও কিছু পালিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে আমরা একজন পাকিস্তানি সেনাসদস্য এবং একজন সেনা বাবুর্চিসহ দুইজনকে বন্দি করতে সক্ষম হই। পরবর্তীকালে তাদেরকে আমরা ভারতের আসাম রাজ্যের ইদ্রনগর ক্যাম্পে হস্তান্তর করি। মুক্তিযুদ্ধ আমার জীবনের সোনালী অধ্যায়। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা সংকলনের এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

স্মৃতিকথন-২৫

সংস্থার নাম: পিপিএসএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বানা, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অলিয়ার রহমান

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমি যুদ্ধ করেছি বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন রণাঙ্গনের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী হয়েছি। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ২৩ তারিখে শিরগ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হচ্ছিল পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করার জন্য। মুক্তিবাহিনীর নিকট খবর এসেছিলো সেদিন বিকেলের দিকে পাকবাহিনী লঞ্চে করে বারাইশিয়া নদীপথে শিরগ্রামের মধ্য দিয়ে বোয়ালমারী যাবে। আমি এবং আমার সঙ্গী সাথীরা আমাদের কমান্ডার মোঃ আব্দুর সাত্তারের দিক নির্দেশনা আর পরামর্শে শিরগ্রাম গোরস্থান এলাকায় বাংকার খুঁড়ে অবস্থান নিই। আমরা সেখানে শত্রুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলাম। যথারীতি বিকাল সাড়ে চারটায় পাকবাহিনীর একটি দল লঞ্চে করে বারাইশিয়া নদীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলো। লঞ্চটি শিরগ্রাম গোরস্থানের কাছে আসতেই আমরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আমরা গুলি ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করি। প্রায় আধঘণ্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে আতিয়ার রহমান ও ময়নুদ্দিন নামে আমার দু'জন সহযোদ্ধা শহিদ হন। পাকিস্তানি সেনাদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো। শত্রুসেনাদের প্রায় ৫ জন সেনাসদস্য নিহত হয়েছিলো। তাদের সাথে বহনকৃত মালামাল ও যুদ্ধাস্ত্রেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো। যুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তানি বাহিনী সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়ে। এভাবেই দু'জন শহীদের আত্মত্যাগে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অদম্য সাহসে সেদিন শিরগ্রামে মুক্তিবাহিনী হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলো।

স্মৃতিকথন-২৬

সংস্থার নাম: নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হামিদ

সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার ভোমরা নামক স্থানে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ছিল। আমাদের দল ভারতের ব্যারাকপুর হতে প্রশিক্ষণ শেষ করে সেই ক্যাম্পে অপারেশনের জন্য রওনা হয়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং একই সাথে সম্মুখ যুদ্ধও হয়। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে বেশ কয়েক জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। অধিকাংশ পাকিস্তানি সেনাসদস্য মারা যায় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়।

এ ছাড়া আমি ঢাকার মিরপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে মেজর হায়দার ও মেজর মাহফুজ বেগ-এর নেতৃত্বে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সেই যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সেনা মারা যায় এবং আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানি সেনাসদস্যরা পালানোর সময় তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন ঘড়ি, আংটি, টাকা-পয়সা, জামা-কাপড় ইত্যাদি ফেলে চলে যায়, যা আমরা পরে প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছিলাম।

স্মৃতিকথন-২৭

সংস্থার নাম: গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: খালিয়া, রাজৈর, মাদারীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী আহমেদ

১৫ই আগস্ট ১৯৭১ রাতে মুক্তিযুদ্ধের দশ নম্বর নৌ সেক্টরের অধীনে সংঘটিত 'অপারেশন জ্যাকপট'-এ যে ৫৫০ জন নৌ-কমান্ডো অংশগ্রহণ

করেন তাদের মধ্যে আমি একজন। অপারেশন মূলত আত্মঘাতী অপারেশন ছিলো। এই অপারেশনে নৌ-কমান্ডোরা এক রাতে পাকিস্তানিদের সমুদ্র ও নদী বন্দরের অস্ত্র ও রসদবাহী অনেক জাহাজ, গানবোট, ফেরি ডুবিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার কর্নেল এম এ জি ওসমানী সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছিলেন, 'কে কে জীবন দিতে রাজি আছো হাত ওঠাও'। আমিই সর্বপ্রথম হাত উঠিয়েছিলাম এবং ওসমানী সাহেব আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বাছাইকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ঐতিহাসিক পলাশীর প্রান্তরে সমবেত করা হয় এবং শপথ পড়ানো হয়। ভাগীরথী নদীতে নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে ৬০ জনকে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পাঠানো হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক চরলক্ষ্যার খামারে পৌঁছাই এবং কলকাতা রেডিও থেকে সাংকেতিক দু'টি গানের অপেক্ষায় থাকি। প্রথম গানটি ছিলো আকাশবাণী 'খ' থেকে 'আমি যতো তোমায় শুনিয়েছিলাম' এবং দ্বিতীয়টি 'আজকে আমার পুতুল প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ি'। প্রথম গানটির বার্তা ছিলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও এবং দ্বিতীয়টির বার্তা ছিলো মাইন বুকে বেঁধে টার্গেটে যাও। ৬০ জনের মধ্য থেকে ৩৯ জনকে ৩ জন করে গ্রুপ করা হয়। সকলেই বুক পানিতে নেমে কমান্ডারের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। আমাদের তিনজনের গ্রুপকে সমুদ্রের ৪-৫ কিমি গভীরে ১৫ হাজার মেট্রিক টন ওজনের মালবাহী এমবি আল আব্বাস জাহাজটি ধ্বংস করার টার্গেট দেয়া হয়। জাহাজটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র, খাদ্য এবং সৈনিক বহন করে এনেছিলো। অপারেশনের জন্য বিদায়ের সময় সহযোদ্ধাদের চোখে পানি ঝরছে। দলনেতার নির্দেশে পায়ে ফিনস লাগিয়ে এবং বুকে লিমপেট মাইন বেঁধে চিত হয়ে সাঁতার দিয়ে জাহাজের কাছে পৌঁছাই। জাহাজের কাছে পৌঁছে তিন বন্ধু জাহাজের গায়ে মাইন লাগানোর কাজ সেরে ফেলি। নদীর মাঝ বরাবর ফিরে আসতেই মাইনগুলো বিস্ফোরিত হওয়া শুরু করে। ওদের আর্তচিৎকার ও বিপদ সংকেতের শব্দে সমগ্র এলাকা স্তব্ধ হয়ে যায়। সফল অপারেশন শেষ করে নির্দেশ অনুযায়ী পলাশীতে পৌঁছে গেলাম। এছাড়া, কুলিয়ার চর থানার সারারচর রেল ব্রিজ ও রেলগাড়ি ধ্বংস করি এবং কুলিয়ারচর থানা দখল করে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে দেই।

স্মৃতিকথন-২৮

সংস্থার নামঃ সাজেদা ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বাট্টাজোড়, বকশিগঞ্জ, জামালপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল মুন্নাফ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং ভারতে গিয়ে তুরাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রথমে ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ নিই এবং পরে ৩ দিনের জঙ্গল প্রশিক্ষণ নেই। এরপর ভারতের পুরাকাশিয়া ক্যাম্প হতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেছিলাম। এর মধ্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করছি। বাংলাদেশের ভায়াডাঙ্গা নামক স্থানে পাকবাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল। প্রথমদিন কমান্ডার ভায়াডাঙ্গা উক্ত ক্যাম্পে কত সংখ্যক সৈন্য আছে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমাকে পাঠান। তথ্য সংগ্রহ করে কমান্ডারকে জানানো হলে তিনি আমাদেরকে পাকবাহিনীর ক্যাম্পটি যুদ্ধ করে দখল করার নির্দেশ দেন। আমরা পাকবাহিনীর ক্যাম্পটি চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করার পর আমাদের তিনজন সঙ্গী পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। এদের মধ্যে টাঙ্গাইলের দুই জন ও বর্তমান শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী থানার নাচন মুহুরী গ্রামের একজন। তিনজনকেই বকশীগঞ্জ পাকবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গুলি করে হত্যা করা হয়। তাদেরকে হত্যা করার সময় ক্যাম্প কমান্ডার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেজর আইয়ুব দম্ভভরে বলেছিলো, 'আমি যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে দেওয়া হবে না।' তাকে ধরার জন্য ঐদিনই রাতের আঁধারে কমান্ডারের নির্দেশে আমাদের এক গ্রুপ ধানুয়া কামালপুরকে চতুর্দিক হতে ঘেরাও করে ফেলে এবং পাহাড়ের ওপর থেকে বোম্বিং করতে থাকে ধানুয়া কামালপুরের উপর। একই সময়ে আমরা আরেক গ্রুপ বকশীগঞ্জের পূর্ব পাশে সি.এন্ড.বি রোডের পাশে অবস্থান করতে থাকি। মেজর আইয়ুবের জিপ গাড়ি সি.এন্ড. বি রোডের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা তার গাড়ি লক্ষ্য করে বৃষ্টির

মতোর গুলি ছুঁড়ি। এই এমবুশে মেজর আইয়ুব নিহত হয়। দিনটি ছিলো ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ১১নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিবাহিনী ধানুয়া কামালপুরে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে কামালপুরকে শত্রুমুক্ত ঘোষণা করে। এ সকল যুদ্ধের অংশ হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত।

স্মৃতিকথন-২৯

সংস্থার নাম: সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কাজিরচর, মুলাদী, বরিশাল

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আলী হোসেন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বরিশাল থেকে আমরা ৮১ জনের একটি দল ভারতের বনগাঁও যাই। সেখানে বাংলাদেশীদের থাকার জন্য একটি ক্যাম্প তৈরি করা হয়। আমরা সবাই সেই ক্যাম্পে ১৫ দিন অবস্থান করার পর জেনারেল ওসমানীর দায়িত্বে সেখান থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের সবাইকে আসাম নেয়া হয়। আসামে ৪৫ দিনের গেরিলা প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা নিয়ে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসি। তারপর বাংলাদেশের যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাক হানাদারের সাথে আমাদের ৭ দিন সম্মুখ যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে আমার সাথে থাকা এক সহযোদ্ধা পাকিস্তানিদের বন্দুকের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অনেক সহযোগী বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। এভাবে একটানা ৭ দিন যুদ্ধ শেষে আমরা যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করি। যুদ্ধ শেষে আমরা বরিশাল চলে আসি। আবার পাক হানাদারের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় যাই। সেখান থেকে আমরা দেশ স্বাধীন হওয়ার খবর পেয়ে বরিশাল চলে আসি। এভাবেই আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা জীবনের মায়া উপেক্ষা করে দেশ স্বাধীন করতে সক্ষম হই।

স্মৃতিকথন-৩০

সংস্থার নাম: আইডিএফ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কদলপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হাসেম চৌধুরী

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানার কদলপুর গ্রামে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানী বাহিনীর মদদে রাজাকার বাহিনী সংগঠিত হয়। রাজাকার বাহিনী গ্রামের নিরীহ মানুষকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন, নিপীড়ন এবং হয়রানি করে। গ্রামবাসীকে এই রাজাকার বাহিনীর নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা মুক্তিযোদ্ধারা একটি অপারেশন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিই। গোপন সূত্রে আমরা খবর পাই যে কদলপুরের ঈশান ভট্ট হাটের দক্ষিণ ব্রিজের ওপর দিয়ে রাজাকাররা তাদের দলবলসহ যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, রাজাকাররা ব্রিজ অতিক্রম করা অবস্থায়ই আমরা তাদেরকে এ্যামবুশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। যথাসময়ে রাজাকারদের ওপর আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মিলে বৃষ্টির মতোন গুলিবর্ষণ করি। তাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও পর্যাপ্ত গোলাবারুদ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ দেই নাই। এই অপারেশনে রাজাকার বাহিনীর বেশ কয়েকজন হতাহত হয় এবং তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে তারা কখনো এলাকায় ফিরে আসার চেষ্টা করেনি।

১৯৭১ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে মদুনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র অপারেশন করা হয়। হাটহাজারী এবং রাউজানের সকল মুক্তিযোদ্ধা যৌথভাবে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান মাহমুদ বীর উত্তম-এর নেতৃত্বে এই অপারেশনে মদুনাঘাটে অবস্থিত বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের চারটি ট্রান্সফরমার ধ্বংস করা হয় এবং তিনজন পাক সেনাকে হত্যা করা হয়। মুক্তিবাহিনীর হাটহাজারী থানার একজন মুক্তিযোদ্ধা এই অপারেশনে শহিদ হন। আমি এ যুদ্ধের একজন অংশগ্রহণকারী। এছাড়া পূর্ব রাউজান ডালারমুখ রাবার বাগানে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা অপারেশন পরিচালনা করি। উক্ত অপারেশনে দুইজন পাকিস্তানী সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়।

স্মৃতিকথন-৩১

সংস্থার নাম: আইডিএফ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সাতকানিয়া ইউনিয়ন, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সামসুল হক

আমি মোঃ সামসুল হক পেশায় একজন কৃষক। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার জীবনের গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসির প্রেক্ষিতে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করি। পরবর্তীকালে সাব-সেক্টর কমান্ডার মুস্তাফিজুর রহমানে নেতৃত্বে বান্দরবানে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর সাতকানিয়া উপজেলার জঙ্গল পদুয়া নামক স্থানে পাকহানাদার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংঘটিত একটি সম্মুখ যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। এই যুদ্ধে ব্যাপক গোলাগুলি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে হানাদার বাহিনীর সৈন্য মারা যায় এবং অনেকেই আহত হয়। সাধারণত সম্মুখ যুদ্ধগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কম থাকলেও এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর তুলনায় মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা বেশি ছিলো। মুক্তিবাহিনীর রণকৌশল ও লোকবলের কাছে হানাদার বাহিনী বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। পরে মুক্তিবাহিনী সুকৌশলে নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে ভাসে।

স্মৃতিকথন-৩২

সংস্থার নাম: ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সুয়ালক, সদর, বান্দরবান

বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল ইসলাম সিকদার

আমি সামসুল ইসলাম সিকদার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিপক্ষে আমি চট্টগ্রাম ১নং সেক্টরের কমান্ডার রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা শুরুতে প্রতিরোধমূলক অনেকগুলো যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে সফলভাবে

লড়াই করি। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র মজুদ না থাকায় অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। অবশ্য পরে সংগঠিত হয়ে উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসের পর থেকে নব উদ্দীপনায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। সেক্টর কমান্ডার রফিকুল ইসলাম-এর নির্দেশনা মোতাবেক শত্রু পক্ষের সাথে লড়াই চলমান থাকে। কমান্ডারের নির্দেশে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা চিহ্নিত রাজাকারদের হত্যা করি। পরবর্তীকালে রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি শত্রুবাহিনী দোহাজারী-চন্দনাইশে অবস্থিত আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পে অতর্কিত হামলা করে। এই হামলায় আমাদের দুইজন সহযোদ্ধা শহিদ হন। এই প্রেক্ষাপটে আমরা সাব-কমান্ডার জলিল কবিরের নেতৃত্বে ধোপছড়ি, চন্দনাইশে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করি।

স্মৃতিকথন-৩৩

সংস্থার নাম: ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ওয়াজ্জা, কাপ্তাই, রাঙামাটি

বীর মুক্তিযোদ্ধা জুবেদ আলী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে ৫নং সেক্টরের অধীনে সুনামগঞ্জে ক্যাপ্টেন হেলালের নেতৃত্বে সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আগস্ট মাসের ৬ তারিখে একটি সম্মুখযুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর একটি গুলি এসে আমার পায়ে লাগে। আহত হওয়া সত্ত্বেও আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাই এবং আমরা পাকবাহিনীকে পিছু হঠতে বাধ্য করি। পরবর্তীকালে আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডার মোঃ সুলেমান আমাকে চিকিৎসার জন্য ক্যাম্পে নিয়ে যান। আমার ও আমার সহযোদ্ধাদের আত্মত্যাগে দেশ স্বাধীন হয়েছে, এটাই আমার বড় তৃপ্তি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমৃদ্ধি ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণের যে আয়োজন করা হয়েছে তার জন্য পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থা আইডিএফ-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্মৃতিকথন-৩৪

সংস্থার নাম: শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: আলগী দুর্গাপুর, হাইমচর, চাঁদপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অনেক ঘটনার মধ্য থেকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরছি। মে মাস ১৯৭১। চাঁদপুর। দক্ষিণাঞ্চলে বৈশের হাট এলাকায় ৫ জন সহযোদ্ধাসহ আমি ভোর রাতে পাকিস্তান নৌবাহিনীর একটি জাহাজ আক্রমণ করি। এসময় একটি গুলি এসে আমার পায়ে লাগে। গুলিটি আমার বাম পায়ের হাঁটুর নীচে সামনের দিকে ঢুকে ভেদ করে পেছন দিকে বেরিয়ে যায়। আমার এক সহযোদ্ধা ভাই, আব্দুর রাজ্জাক আমাকে নিয়ে ফরিদগঞ্জে ডাঃ আঃ মান্নান মল্লিক দ্বারা চিকিৎসা করান। সেখানে কিছুদিন গোপনে চিকিৎসা নিই এবং কিছুটা সুস্থ হয়ে পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করি। বৈশের হাট এলাকার ঘরবাড়িগুলো পাকিস্তানি সেনারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এরপর আমর বাঘরা বাজার এলাকায় সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এই যুদ্ধে হেদায়েত উল্লাহ শেখ ও শহিদুল্লাহসহ আমার অনেক সহযোদ্ধা গুরুতর আহত হয়। যুদ্ধদিনের ঘটনাগুলো যখন মনে পড়ে তখন আমি অনুভব করি আমার অনেক সহযোদ্ধার কথা, যারা অনেকে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, আবার অনেকে আহত হয়েও অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। আজকের স্বাধীনতা কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয়, অনেক মা-বোনের আত্মত্যাগ ও বহু মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাথা সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল। তাই একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি অনেক গর্ব অনুভব করি।

স্মৃতিকথন-৩৫

সংস্থার নাম: শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: আলাওলপুর, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা বাচ্চু

আমি গোলাম মোস্তফা বাচ্চু, বর্তমানে শরীয়তপুর জেলার মুক্তিযোদ্ধা

সংসদের সহকারী কমান্ডার। এই সুবাদে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমার হৃদ্যতা রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় আমরা গর্বিত। যে ত্যাগ, অনিশ্চয়তা, অসীম সাহস আর দেশপ্রেম নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন, এই সম্মান তাঁদের প্রাপ্য।

যুদ্ধকালীন কিছু স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করছি। আমি স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদান করার জন্য ভারতের আগরতলা কংগ্রেস ভবন হয়ে মেলাঘর ক্যাম্পে যাই এবং ওম্পিনগর এফ.এফ. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১ দিন গেরিলা প্রশিক্ষণ করে মেলাঘর ক্যাম্প থেকে স্টেনগান ও গ্রেনেড নিয়ে শরীয়তপুরের ডামুড্যা ক্যাম্পে যোগদান করি। এই ক্যাম্প থেকে ২৫ জনের একটি দলকে গাইড করে ভারতের মেলাঘর ক্যাম্পে নিয়ে যাই। পরবর্তীকালে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাথে সীমান্ত বাঙ্কারে পাহারায় নিয়োজিত হই। ৬ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে আমাদের যুদ্ধে প্রাণশক্তি আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। স্থল, নৌ ও আকাশপথে ভারতের যুদ্ধবিমান পাকহানাদারদের লক্ষ্য করে কুমিল্লায় বোম্বিং শুরু করলে পাকহানাদার বাহিনী পালাবার পথ খোঁজে। একদল পাকবাহিনী চান্দিনার ফুলপুরের দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী শুকনো খালে আশ্রয় নেয়। ৮ ডিসেম্বর কমান্ডার হিরোর নেতৃত্বে আমরা ২,০০০ মুক্তিসেনা চান্দিনা হাই স্কুলে ব্যারিকেড দিয়ে কয়েকজন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করি এবং আহত নিহত লোকজনসহ অনেক বীরাঙ্গনাকে উদ্ধার করি। এরপর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পাকবাহিনীর অবস্থান জেনে কমান্ডারের নির্দেশে ৯ ডিসেম্বর ভোর ৫টায় আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করি। আমাদের প্রথম আক্রমণেই তারা পরাস্ত হয় এবং আমাদের কাছে অনেক পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে। আমি এই যুদ্ধে আহত হই। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাদের এই আত্মসমর্পণের খবর প্রচারিত হয়। ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ চান্দিনা-গৌরীপুর-দাউদকান্দি এলাকা হানাদারমুক্ত হয়। যুদ্ধ নিয়ে আমার লেখা কবিতার বই "প্রজন্মের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু" ও "নারী মানে বিশ্ব মা" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গণগ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

স্মৃতিকথন-৩৬

সংস্থার নাম: শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কাচিকাঁটা, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিক সরদার

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা কয়েকজন রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পার হয়ে ৪৫ দিন ভারতে মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাংলাদেশে ফিরে আসি। বাংলাদেশের কুমিল্লা দিঘীর পাড় এলাকায় আমরা কমান্ডারের অধীনে যুদ্ধ করি। এইসকল যুদ্ধে দুইজন যোদ্ধা জাহিদুল্লাহ হাওলাদার এবং মান্নান হাওলাদারসহ আমাদের আরো অনেক সহযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জয় বাংলা স্লোগান ছিলো আমাদের প্রাণের স্লোগান। একটি খণ্ডযুদ্ধে এই স্লোগান দিয়ে গ্রেনেড চার্জ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ১৪ জন সেনাকে হত্যা করতে পেরেছিলাম আমরা। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলোর মধ্যে এটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। তবে একটি পেশাদার সুসজ্জিত হানাদার বাহিনীকে বাংলার মাটিতে শোচনীয়ভাবে হারানোর কৃতিত্ব শুধুই মুক্তিযোদ্ধাদের নয়। বাংলার সর্বস্তরের মুক্তিপাগল জনগণ এই কৃতিত্বের অংশীদার। এদেশের মানুষ কখনো সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়নি। ভবিষ্যতেও কখনো মেনে নিবে না। জয় বাংলা। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

স্মৃতিকথন-৩৭

সংস্থার নাম: উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: চান্দাইকোনা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা এস. এম. আব্দুল বারী

আমি, এস. এম. আব্দুল বারী, একজন গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৭নং সেক্টরে যুদ্ধ করি। এই সেক্টরে অন্যতম তিনটি অপারেশন যথাক্রমে

সাউথটোলা, কাজীপুর থানা এবং বড়ইটোলী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা বিভিন্ন সময় অতর্কিতভাবে শত্রু পক্ষের ক্যাম্প আক্রমণ করি। ক্যাম্পে আক্রমণ করার ফলে বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয় এবং আমরা তাদের অনেক অস্ত্র লুট করি। এই সকল যুদ্ধে আমাদের তিনজন সহযোদ্ধা শহিদ হন (আমজাদ, সোহরাব ও রবিলাল)। আমজাদকে দোয়েলে ও সোহরাবকে বাওখোলায় দাফন করা হয় এবং রবিলালকে নদীর পাড়ে সমাধিস্থ করা হয়। এ সকল যুদ্ধে শত্রুপক্ষেরও বেশকিছু সৈন্য নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি যার মাধ্যমে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে।

স্মৃতিকথন-৩৮

সংস্থার নাম: পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন (পিএসএফ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: গনেশপুর, মান্দা, নওগাঁ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক

আমার যুদ্ধকালীন স্মৃতির মধ্যে স্মরণীয় একটি ঘটনা বলছি। আমরা বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া থানার পূর্ব পাশে খালের ওপর ক্যাম্পে ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিলো পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পে আক্রমণ করে ক্যাম্পটিকে ধ্বংস করা। আমরা সংখ্যায় ছিলাম ১৭/১৮ জন। আমরা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল নিয়ে অবস্থান করছিলাম। কমান্ডারের নির্দেশ ছিলো থানার দক্ষিণ পাশ হতে গুলির শব্দ আসলে ক্যাম্প আক্রমণ শুরু করতে হবে। কিন্তু গুলির আওয়াজ আসলো উত্তর দিক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা গুলিবর্ষণ শুরু করি। রাতভর তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলে। ফজরের নামাজের পূর্ব মুহূর্তে জানতে পারি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আমাদের একজন সহযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হয়েছেন। তিনি হলেন বগুড়ার সান্তাহারের আজিজার রহমান। সকাল হওয়ার আগেই আমরা তাঁদেরকে পরাস্ত করতে সমর্থ হই। এটিই ছিলো আমার যুদ্ধদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি স্মৃতি যা স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে থাকবে চিরকাল।

স্মৃতিকথন-৩৯

সংস্থার নাম: ঘাসফুল

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মেখল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল হক

২৫ মার্চের কালরাত্রিতে যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তখন আমি চট্টগ্রামের ষোলশহরস্থ একটি গুদামে অবস্থানরত জেড ফোর্স ব্রিগেডে কর্মরত ছিলাম। সেখানে পাকিস্তানি অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট কর্নেল আব্দুর রশীদ-এর নিয়ন্ত্রণে জেড ফোর্সের সেই বিগ্রেড পরিচালিত হতো। বিভিন্নভাবে খবর আসতে শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকাকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে। মুক্তিকামী সৈন্যরা তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। বাঙালি অফিসাররা অধীর আগ্রহে নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো। এরই মধ্যে লেফট্যানেন্ট কর্নেল আব্দুর রশীদ এর নির্দেশে ষোলশহর থেকে দুই দফায় বেশ কিছু বাঙালি সৈন্যকে চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হলো। তৃতীয় দফায় আরো সৈন্য নেয়ার তালিকা আসলে সেখানে আমার নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী তৃতীয় দফায় ষোলশহর থেকে বাঙালি সৈন্য নিতে আসার আগেই আমরা বাঙালি সৈন্যরা এই ক্যাম্পে বিদ্রোহ করি। বেঁচে যায় অনেক মুক্তিকামী সৈনিক। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে সেই রাতে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট কর্নেল আব্দুর রশীদকে বন্দি করে ষোলশহরের ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। বাঙালি অফিসারদের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্নেল আব্দুর রশীদ জানজুয়ার ক্যাম্পে বন্দি থাকবে। কিন্তু তার নির্দেশে বহু বাঙালি সৈন্যকে হত্যা করায় তিনি জানজুয়া ক্যাম্পের বাঙালি সৈন্যদের আক্রোশের শিকার হন। কিছু সৈন্য তাকে গুলি করে হত্যা করে। এভাবে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে ৯ মাসের যুদ্ধ শেষে আমরা বিজয় অর্জন করি।

স্মৃতিকথন-৪০

সংস্থার নাম: মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: হলদিয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আবু তাহের

আমি আবু তাহের, আমার বাবার নাম মৃত রহুল আমিন এবং মাতার নাম মৃত ছাপা খাতুন। আমি বাবা মায়ের বড় সন্তান। ৪ জুন ১৯৫৩ সালে রাউজান থানার অন্তর্গত হলদিয়া ইউনিয়নের লস্কর উজিরবাড়িতে আমার জন্ম। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি পাকিস্তানের করাচি শহরের অ ৩/৬, মাঙ্গাফি রোড পাক কলোনিতে বাস করি। শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার কারণে তখন সেখানে আমাদের ওপর পাকিস্তানিরা চরম নির্যাতন শুরু করে। আমরা এমনকি ঘর থেকে বের হতে পারছিলাম না। তারা আমাদেরকে উর্দু ভাষায় অশ্রাব্য গালি দিতো এবং মারধর করতো। এমতাবস্থায় সেখানে আমার বন্ধু সোনা মিয়ার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে আমি বাংলাদেশে পৌঁছাই। এখানে এসে ১৪ দিন থাকার পর শহিদ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান-এর সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি। ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ ১নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার কামাল উদ্দীন ও সাব-সেক্টর কমান্ডার আবু আহম্মদ-এর যৌথ নেতৃত্বে রাউজান উপজেলাধীন হলদিয়া ইউনিয়নের আমিরহাট নামক স্থানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে আবদুল মান্নান শহিদ হন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আমরা পাক-সেনাদেরকে পরাস্ত করতে সমর্থ হই। এরপর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত বিজয় লাভ করি। জাতি হিসেবে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এই কারণে যে বর্তমানে আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং একই সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ দুটি ঘটনা একই সাথে উদ্‌যাপন করতে পেরে আমি নিজেও অনেক গর্ব অনুভব করছি।

স্মৃতিকথন-৪১

সংস্থার নাম: পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সুরমা, সদর, সুনামগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাকিম

সারাদেশে যুদ্ধ চলছে। লক্ষ তরুণ বঙ্গবন্ধুর ডাকে জীবন বাজি রেখে দেশ মাতৃকাকে বাঁচাতে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মনে একটাই প্রতিজ্ঞা -- দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করে তবেই থামবো।

১৯৭১ সাল, কত তারিখ ছিলো! ঠিক মনে নেই। একদিন বেড়ীগাঁও এবং বাঘমারাতে পাকসেনাদের সাথে আমাদের ভয়াবহ এক সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সহযোদ্ধাদের মাঝে কয়েকজন এই অপারেশনে শাহাদাৎ বরণ করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমি বেঁচে যাই। সহযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং তাদের একে একে শহিদ হবার প্রতিটি দৃশ্য চোখের সামনে আজও ভেসে ওঠে। যখনই সহযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করার স্মৃতি মনে পড়ে তখনই শরীরের লোমগুলো শিউরে ওঠে। যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিগুলো কখনও স্মৃতিপট থেকে মুছবে না বরং চিরসবুজ হয়ে স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

স্মৃতিকথন-৪২

সংস্থার নাম: মমতা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: গড়দুয়ারা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলী আকবর

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাস। আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সুবেদার হিসাবে কাজ করতাম। '৭১-এর জানুয়ারিতে কৌশল করে ছুটিতে আসার পর দেশের পরিস্থিতির কারণে আর কর্মস্থলে যোগদান করিনি। মার্চে যুদ্ধ শুরু হলে নতুন বিবাহিত জীবনের মায়া ত্যাগ করে রাউজানে ফণি বড়ুয়া নামে এক পুলিশ সদস্যের সাথে পরিচয় হয় এবং তাঁর সাথে কয়েকদিন

যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এরপর হরিণা ক্যাম্পে যোগদান করি। কিছুদিন পর আগরতলা ক্যাম্পে যোগদান করি। এসময় আমি মেজর আবু ওসমান সাহেবের সাথে কাজ করি। আর্মার কোর (Armoured Corp)-এর সৈন্য হওয়ায় মেজর আবু ওসমান সাহেব আমাকে জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর সাথে কাজ করার সুযোগ করে দেন। আমি আগরতলা ক্যাম্পে জেনারেল ওসমানী সাহেবের বডিগার্ড হিসাবে কাজ করেছি, পাশাপাশি এ টি এম সালাউদ্দিন সাহেবের সাথেও কাজ করেছি। জেনারেল ওসমানীর সাথে কাজ করার সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের সকল সেক্টরের যুদ্ধের পরিকল্পনা, অগ্রগতি, বিজয় ইত্যাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করি।

স্মৃতিকথন-৪৩

সংস্থার নাম: মমতা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: উত্তর মাদার্শা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিক আহমদ

ফেনীর চাঁনগাজীতে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। পাকবাহিনী বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করেন। আমরা পাল্টা জবাব দেওয়া শুরু করি। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা পাকবাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে পাকবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই অপারেশনে আমাদের কয়েকজন সহযোদ্ধা আহত হয়। পরবর্তীকালে অক্টোবর '৭১-এ মদুনাঘাটে দায়িত্ব পালনকালে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান মাহমুদ বীর উত্তম-এর নেতৃত্বে মদুনাঘাট বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন ধ্বংস করি। এই সাব-স্টেশনের আশেপাশে বাংকার স্থাপন করে বিপুল পরিমাণ পাকিস্তানি সৈন্য ওৎ পেতে ছিলো। কিন্তু, আমাদের কমান্ডার ও সহযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতায় তারা শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং আমরা ট্রান্সফর্মার ধ্বংস করি। এই অপারেশনে আবদুল মান্নান নামে আমাদের দলের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। তার গ্রামের বাড়ি ছিলো বর্তমান কুমিল্লা জেলায়।

স্মৃতিকথন-৪৪

সংস্থার নাম: মমতা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বরকল, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক আবুল মুহি

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শাসন, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সেদিন আমার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে হয়েছিলো। কেননা তাদের এই অপশাসনের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে না পারলে এদেশ কোনদিন বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো না। কমান্ডার সার্জেন্ট মহি আলমের নেতৃত্বে আমরা ১নং সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ১নং সেক্টরের চন্দনাইশ, আনোয়ারা, পটিয়া, বোয়ালখালী, চকরিয়ার বিভিন্ন জায়গায় আমরা যুদ্ধ করেছি। মূলত চন্দনাইশ ও আনোয়ারা ছিলো আমাদের প্রধান রণক্ষেত্র। '৭১ এর আগস্ট মাসে আনোয়ারায় আমাদের প্রথম অপারেশন সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় অপারেশন সংঘটিত হয় চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া সংলগ্ন বসরতনগর মাদ্রাসায়। সে অপারেশনে মোঃ আব্দুস সবুর নামে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। এসময় মুক্তিযোদ্ধা হাবীবুর রহমান, মরিদুল আলমসহ আরও অনেকে আহত হয়। আহত হাবীবুর রহমান ও মরিদুল আলমকে আমরা বিশেষ সেবা প্রদান করি। কিন্তু আগস্টের শেষের দিকে মরিদুল আলম মারা যায়। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। কারণ মরিদুল আলম ছিলেন মেধাবী তরুণ ছাত্রনেতা। মৃত্যুর আগে তৈলার দ্বীপ লতিফ সাহেবের বাসায় তার সাথে আমার শেষ দেখা হয়। সর্বশেষ পটিয়া থানার কৈ গ্রামে আমাদের অপারেশন পরিচালিত হয়। এই অপারেশনে আমরা শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ পিছু হটতে বাধ্য করি। এই অপারেশনে বরকলের রফিকুল ইসলাম কাজেমী, সার্জেন্ট মহি আলম শহিদ হয়। ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি। আমি মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

স্মৃতিকথন-৪৫

সংস্থার নাম: জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ধনেশ্বরগাতী, শালিখা, মাগুরা

বীর মুক্তিযোদ্ধা গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস

মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতি আজো হৃদয়ে গেঁথে আছে। এর মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বেশি মনে পড়ে। গাজিরহাটে এক রাতে টহলের সময় একটি বাড়ি থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। আমরা বাড়িটিতে কয়েকেজন মিলে প্রবেশ করি এবং জানতে চাই, 'শিশুটি কেন এতো কান্না করছে?'। তখন বাসা থেকে এক মুরব্বি বের হয়ে এসে অশ্রুসজল চোখে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা তোমরা কারা?' আমি বললাম, 'ভয়ের কোন কারণ নেই, আপনি আমাদেরকে জানান বাচ্চাটি এতো বেশি কান্না করছে কেন'। তখন তিনি বললেন, 'আমার ছেলের বউ আজ ৭ দিন হলো বাচ্চা প্রসব করেছে। কিন্তু বাড়িতে কোন খাবার না থাকায় মা খেতে পাচ্ছে না তাই বাচ্চাও দুধ পাচ্ছে না। তাই কান্নাকাটি করছে। বাচ্চার খাবার সংগ্রহ করার কোন অবকাশ আমাদের নেই।' একথা শুনে আমরা আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে খাবার যোগাড় করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও খাবার যোগাড় করতে পারলাম না। তখন আমার মাথায় পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প থেকে খাবার আনার বুদ্ধি চাপলো। আমি বিহারী সেজে কালিগঞ্জ মিলিটারি ক্যাম্পে গেলাম এবং তাদের সাথে আলাপ পরিচয় করলাম। নিজের বাড়িতে নেয়ার কথা বলে তাদের কাছ থেকে কিছু শুকনা খাবার ও বাচ্চার জন্য দুধ সংগ্রহ করে সেই বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। যুদ্ধ শেষে আমারা স্বাধীন হলাম। এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়লে ভালো লাগে যে আমার একটা সাজানো মিথ্যা একজন মা ও শিশুর জীবন রক্ষা করেছিলো।

স্মৃতিকথন-৪৬

সংস্থার নাম: জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: পায়রা, অভয়নগর, যশোর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মাদ আলী মোল্যা

আমি ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে রাজাকার কর্তৃক আটক হই। আমাকে পায়রা বাজার হতে আটক করে নওয়াপাড়া নিয়ে আটকে রেখে প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন করে। আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাতের আঁধারে দেয়াল পত্রিকা লিখতাম, রেডিওতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ভাষণ, গান শুনিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতাম। তাছাড়া ভারতীয় পত্রিকা পড়ে জনগণকে শুনিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উৎসাহিত করতাম। এগুলোই ছিলো আমার অপরাধ। প্রচণ্ড নির্যাতনে এক পর্যায়ে মনে হয়েছিলো আটকাবস্থা থেকে রেহাই পাবো না, রাজাকারদের হাতেই আমার মৃত্যু হবে। এভাবে আটক থাকার তিন দিনের মাথায় রাজাকারদের এই আস্তানায় মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালায় এবং আমিসহ আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে তারা উদ্ধার করে।

স্মৃতিকথন-৪৭

সংস্থার নাম: ঘাসফুল

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: গুমান মর্দ্দন, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুর রহমান

'৭১-এর এপ্রিলে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে ভারতে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য চলে আসি। আমরা ৭০/৭৫ জনের একটা গ্রুপ ভারতে যাওয়ার পথে সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়ি। পাকসেনারা বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ করতে থাকে। তারা ছিলো আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত অথচ আমরা ছিলাম নিরস্ত্র। এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে সকলে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। এখানে অনেকেই হাতে পায়েসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুলিবিদ্ধ হয়। পাকসেনাদের এই আক্রমণে পাহাড়ি-বাঙালিসহ প্রায় ৯/১০ জন মানুষ শহিদ হন। আমার এলাকা গুমানমর্দ্দনের অধিবাসী মোঃ আলীম ও

মোঃ দলিলুর রহমান এখানেই শহিদ হন। আমিও হাতে পায়ে গুলি লেগে আহত হই। পাকসেনারা চলে গেলে আবার ৬/৭ জন একত্রিত হয়ে আমরা ভারতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে পৌঁছাই। সেখান থেকে প্রথমে আমাদেরকে হরিণা ক্যাম্পে নিয়ে আহতদের সেবা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। দিন কয়েক পরে ভারতীয় সেনাবাহিনী এসে আমাদেরকে প্ল্যাটুন প্রশিক্ষণে কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে দেশে ফিরে দেশকে পাকিস্তানি দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

স্মৃতিকথন-৪৮

সংস্থার নাম: অ্যাকশন্ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন (এ্যাডো)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: জুনিয়াদহ, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাকিম

মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণকালে আমার সহযোদ্ধা জসিম উদ্দিন শহিদ হন। সেদিন আমিও মৃত্যুকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম বাংলার আকাশে স্বাধীনতার লাল সূর্য দেখে যেতে পারবো না। দীর্ঘসময় যুদ্ধ করার কারণে আমরা প্রায় দুই দিনেরও বেশি সময় ধরে কোন খাবার-পানি পাইনি। এ সময় আমি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ি। কোথাও কোন পানীয় জলের সন্ধান পাচ্ছিলাম না। পিপাসায় বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম। পরে কোন উপায়ান্তর না পেয়ে সামনে একটি ছোট্ট ডোবা দেখতে পাই। কিন্তু সেই ডোবায় ছিলো পাটের জাগ দেওয়া। পানি দিয়ে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো। জীবন বাঁচানোর তাগিদে সেই পানি পান করি এবং জীবন রক্ষা করি। এমন অনেক ঘটনা আছে যা মনে পড়লে গা শিউরে উঠে। অন্য একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। দিনটি ছিলো ৭ ডিসেম্বর '৭১। দেশের সব জায়গায় পাকবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করছে। ভেড়ামারার উত্তর রেলগেটে এরকমই একটি সম্মুখ যুদ্ধে জেলা কমান্ডার মোঃ রাশিদুল আলম শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুলি লেগে আহত হন। আহত অবস্থায় তাকে আমরা হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করি। রাশিদুলের মতো নাম না জানা আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধা সেদিন শহিদ হন। পরদিন ৮ ডিসেম্বর

ভেড়ামারা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৬ ডিসেম্বর পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করলে আমরা অর্জন করি আমাদের স্বাধীনতা।

স্মৃতিকথন-৪৯

সংস্থার নাম: হীড বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মনসুরনগর, রাজনগর, মৌলভীবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা সমরেন্দ্র দেব

৭১'-এ সালে আমি ছিলাম ২২ বছরের যুবক। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ৪নং সেক্টরের অধীনে ৫নং সাব-সেক্টরে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করি। আমার সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন লেফট্যানেন্ট ওয়াহিদুজ্জামান। এই সাব-সেক্টরের সদর দফতর ছিলো মৌলভীবাজারের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে চাইলেও বাড়ির একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ায় পরিবার থেকে বাধা আসে। যুদ্ধ শুরু হলে পরিবারের সকল সদস্যসহ ভারতের কুমারঘাট ইন্ডাস্ট্রি ক্যাম্পে শরণার্থী হিসেবে অবস্থান করি। ভারতে গিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে থাকাকালীন খুবই খারাপ লাগছিলো, মনে মনে অনেক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ক্যাম্পে থাকাকালীন আমি প্রথম কয়েকদিন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না কী করবো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে বলা কথাগুলোই কানে বাজছিলো। পরবর্তীকালে শরণার্থী ক্যাম্প থেকে জানতে পারি লোহারবনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সেখান থেকে পালিয়ে পরিবারের কাউকে না জানিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে থাকা আমার গ্রামের বন্ধু শচীন্দ্র দেব, নিত্যানন্দ দেব ও লালু গোপাল দেবসহ চারজন মিলে চলে যাই মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তিন মাস প্রশিক্ষণ করার কথা থাকলেও তা দুই মাসেই শেষ হয়ে যায়। সেখান থেকে আমিসহ বাকি কয়েকশ যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ শেষে পাঠিয়ে দেয়া হয় রাতাছড়া (ত্রিপুরা) রেস্ট ক্যাম্পে। আমরা সেখানে সকলে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। পরে সত্তর জনের একটি দলের সঙ্গে আমি আগস্ট মাসে ভারতের কুকিতল মহকুমা দিয়ে মৌলভীবাজার জেলার জুরী হয়ে মৌলভীবাজার লাঠিটিলাতে এসে ক্যাম্প করেছিলাম। সেই ক্যাম্পে আমার গ্রামের সেই তিন বন্ধুও ছিলো।

আমরা একসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এরই মধ্যে ক্যাম্পের কয়েকজন সহযোদ্ধা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে। প্রচণ্ড নির্যাতনের মুখে তারা আমাদের ক্যাম্পের তথ্য পাকিস্তানিদের দিয়ে দেয়ায় আমরা ক্যাম্প ছেড়ে সকলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ি। একটানা দুই দিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে। শুধু পানি খেয়ে আমরা যুদ্ধ করেছি। রাতের অন্ধকার হলে বেরিয়ে পড়তাম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাংকার ধ্বংস করতে।

সেই সময়ের একটি ঘটনা সারাজীবন মনে থাকবে। আমরা জানতে পারি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংকার করেছে সেই লাঠিটিলার ওপরে যেখানে আমরা প্রথম অবস্থান করেছিলাম। সাব-সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশ -- সেই বাংকারে অপারেশন চালাতে হবে আজ রাতে। এরই মধ্যে আমাদের কাছে কয়েকটি গ্রেনেড এসে পৌঁছেছে। আমরা সেই অপারেশনে অংশগ্রহণ করি ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা। সঙ্গে ছিলো আমার গ্রামের বন্ধু লালু গোপাল দেব। লাঠিটিলা পাহাড়ের সবচেয়ে খাড়া ঢাল দিয়ে আমরা ওপরে উঠি যাতে পাকিস্তানি বাহিনীর নজর এড়াতে পারি। শুধু একহাতে ভর দিয়ে আমাদেরকে এই পাহাড়ে উঠতে হয়েছে। এক হাতে গ্রেনেড, পিঠে ভারি অস্ত্র, অন্য হাতে ধারালো গোছি দিয়ে মাটিতে আঁকড়ে ধরে ওপরে টিলায় ওঠা যে কি কষ্টের তা বলে বোঝানো যাবে না। জীবনের মায়া ত্যাগ করে নির্ভয়ে উঠতে থাকি ওপরে। এক পর্যায়ে সবাই বাংকারের কাছাকাছি গিয়ে তাদের ওপর হামলা করি। পাকিস্তানি বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে গুলি লেগে পাশেই থাকা আমার বন্ধু লালু গোপাল দেব শাহাদাৎ বরণ করে। অল্পের জন্যই আমি বেঁচে যাই। যুদ্ধদিনের এই স্মৃতি আমি কখনও ভুলবো না।

স্মৃতিকথন-৫০

সংস্থার নামঃ হীড বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ আয়লা পাতাকাটা, বরগুনা সদর, বরগুনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সামসুল হক সানু

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সামসুল হক সানু। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনে নিজ ইউনিয়নের পাশে পায়রা নদীতে

যুদ্ধ জাহাজ এসেছিলো। ৪টি বন্দুক সংগ্রহ করে আমরা পাকিস্তানিদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার চেষ্টা করি। পাক বাহিনীর ভারী কামান ও বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের আক্রমণের মুখে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। পরবর্তীকালে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রের জন্য ভারত গমন করি। ভারতে যাওয়ার পথে বাগেরহাট জেলাধীন সুন্দরবন এলাকায় বগি শরণখোলা নামক স্থানে পাকবাহিনীকে প্রতিহত করতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। একই এলাকায় শিবশা নদীর পাড়ে রাজাকারেরা শরণার্থীদের নৌকা থামিয়ে ডাকাতি করার সময় রাজাকারদের হটিয়ে দিয়ে শরণার্থীদের উদ্ধার করে ভারত যেতে সাহায্য করি। পাকিস্তানি দখলদারিত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করতে এভাবে দীর্ঘ নয় মাস আমি আমার সহযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করি। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি।

স্মৃতিকথন-৫১

সংস্থার নাম: হীড বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: আদমপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবু সেনা সিংহ

মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়ের কথা। পাঞ্জাবীরা আমাকে দিয়ে পাহাড়ের দুই পাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করাতো। পাহাড় থেকে বড় বড় গাছগুলো কেটে তাদেরকে বাংকার বানিয়ে দিতাম। আর যদি এ কাজ না করতাম তাহলে আমাদেরকে মারধোর করতো। অনেক সময় গুলিও করতো। এক পর্যায়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলাম। পাঞ্জাবীদের এই সব অত্যাচার আমাদের আর ভালো লাগছিলো না। একদিন আমরা পাঁচজনের একটি দল সুন্দর পোশাক পরে ভারতের ধুলিগাঁও নামক স্থানে পৌঁছাই। সেখানে আমার মামার বাড়ি ছিল। মামার বাড়ি যেতে দায়িত্বরত পুলিশ পথিমধ্যে আমাকে আটক করে থানায় নিয়ে যান। দায়িত্বরত পুলিশ অফিসার আমাকে আমার ঠিকানা ও চলে আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলো। আমি সত্যি কথা বললাম যে, আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য এবং প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য এসেছি। পুলিশ অফিসার বললেন আপনারা কতজন

এসেছেন? আমি বললাম পাঁচজন। পুলিশ অফিসার একজন মণিপুরি ছিলেন এবং আমিও একজন মণিপুরি। আমার সুন্দর চেহারার জন্য তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং বললেন মুক্তিযুদ্ধে গেলে তো আপনারা মারা পড়তে পারেন। তখন আমি বললাম, 'স্যার এমনিতেই আমরা মারা যাচ্ছি, তাই যদি বাঁচতে চাই তাহলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে বীরের বেশে বেঁচে থাকবো।' তখন তিনি আমাদের পাঁচজনকে কৈলাশহরের মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে নিয়ে গেলেন এবং প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে আমরা প্রথমে দুই-তিন দিন প্রশিক্ষণের পর আসামের লোহারবনে আসলাম এবং এখানে প্রায় এক মাস প্রশিক্ষণ নিলাম। প্রশিক্ষণের পর আমাদেরকে ৪ নম্বর সেক্টরের অধীনে কমান্ডার সাজ্জাদুর রহমানের দায়িত্বে ভারতের কমলপুর বালিগাঁও ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমারা ছিলাম ধলাই নদীর এপারে আর ওপারে ছিলো পাঞ্জাবীরা। এখানে প্রথমে পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের সাথে গোলাগুলি হয়। আমরা তাদের পরাজিত করি। পাঞ্জাবীদের হারিয়ে যখন আমরা বাংলাদেশের ভেতরে আসলাম তখন এলাকার কোন বাড়িতে আমাদের থাকতে দিতে চাইছিলো না। আমরা তখন শ্রীমঙ্গল পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে শুরু করলাম। আমরা প্রায় ৮০ জন মুক্তিযোদ্ধা প্রায় দেড় মাস পাহাড়ে লুকিয়ে থেকে দলে দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমার টাইফয়েড জ্বর হয়ে যায়। আমরা দলে থাকি ৭ জন। চূড়ান্ত বিজয়ের আগে আমি পাঞ্জাবীদের হাতে ধরা পড়ে যাই। তারা আমাকে দেশ স্বাধীন হওয়ার দিন মুক্তি দেয়।

স্মৃতিকথন-৫২

সংস্থার নাম: টিএমএসএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ফতেপুর, রাজনগর, মৌলভীবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিমল দাস

আমি ছিলাম বাংলাদেশের একজন সাধারণ কৃষক ঘরের সন্তান। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে মৌলভীবাজারের লাতু বর্ডার দিয়ে ভারতের ত্রিপুরার

লোহারবন্ধ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে দীর্ঘ এক মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। অতঃপর মৌলভীবাজারের দিলকুশ বাগান ও লাঠিটিলা এলাকা দিয়ে মে মাসের শেষভাগে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। তৎকালীন ৪নং সেক্টর কমান্ডার সি আর দত্তের নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জুন মাসের প্রথম দিকে দিলকুশ বাগান ও আছরের পুল এলাকায় সম্মুখ যুদ্ধে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর ১২ জন নিহত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর ৫ জন শহিদ হন। ৬ জুলাই সকাল বেলায় আছরের পুল এলাকায় পুনরায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আমার নিকট আত্মীয় ও সহযোদ্ধাসহ ৩ জন শহিদ হন। নিজ হাতে তাদের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাই এবং তাঁদের দাফনের স্মৃতি আজও আমাকে কষ্ট দেয়। বুকের তাজা রক্ত দেশ মাতৃকার জন্য অকাতরে কীভাবে দিতে হয় তা প্রথম সেইদিন দেখলাম। পরবর্তীকালে পাক হানাদার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৫ জুলাই দিলকুশ বাগান হয়ে পাথরটিলা দিয়ে জুড়ি এলাকায় অবস্থান করি। সেখানেও সম্মুখযুদ্ধ করে একে একে জুড়ি ও কুলাউড়া শত্রুমুক্ত করি। আগস্টে কুলাউড়া হতে সিলেট চলে আসি এবং রেলস্টেশনে এক রাত্রি যাপন করি। পরবর্তীকালে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে জামিয়া স্কুলে ১৫ দিন অবস্থান করে লেঃ ওয়াফিক জামান-এর নেতৃত্বে রেল স্টেশন শত্রুমুক্ত করি। পুনরায় নির্দেশনা পেয়ে যৌথবাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে অপারেশনে অংশ নিয়ে ৬ ডিসেম্বর মৌলভীবাজারের শমসেরনগরকে শত্রুমুক্ত করতে সমর্থ হই।

স্মৃতিকথন-৫৩

সংস্থার নামঃ টিএমএসএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ কামারচাক, রাজনগর, মৌলভীবাজার।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শরদিন্দু কুমার দে

বাংলায় তখন শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। প্রথমে কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী ও আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ভারতের কৈলাশহর লোহারবন্দ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। পরে আরও ২১ দিন জিএলডব্লিউ প্রশিক্ষণ শেষে করিমগঞ্জে এসে সেখান থেকে জকিগঞ্জের কানাইঘাট দিয়ে

বাংলাদেশে প্রবেশ করি। তখন জকিগঞ্জের ওসি বিভিন্ন অপারেশনের পরামর্শ দেন। আমরা রাস্তার ওপরের ব্রিজ ভেঙে দেই যাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা জকিগঞ্জে ঢুকতে না পারে। সেখানকার রাজাকারদের ধরে এনে ক্যাপ্টেন হামিদের কাছে নিয়ে যাই। হরিপুর হতে প্রায় ০২ মাইল দূরে রাস্তায় আমরা মাইন পুঁতে রাখি। এতে পাকিস্তানি সৈন্যদের ট্যাংক, গাড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই ঘটনায় ০৩ জন রাজাকার ও ০৬ জন পাকিস্তানি সৈন্য মারা যায়। আমরা পার্শ্ববর্তী এলাকায় আশ্রয় নেই। কয়েক ঘণ্টা পর রাজাকাররা আমাদের আত্মগোপনের খবর পেয়ে যে বাড়িতে ছিলাম সেখানে পাকবাহিনীসহ আক্রমণ করতে আসে। আমরাও বুঝতে পেরে ধানক্ষেতে লুকিয়ে থাকি। পরে জানতে পারলাম সেই বাড়ির ৪ জন লোককে রাজাকার ধরে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে দুই জনকে ছেড়ে দেয় কিন্তু অন্য দুই জনকে খাদিম নগরে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। ওই সময় দুই দিন আমরা পানি খেয়ে কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করি। হরিপুর হাওরের পাশে রাস্তার ওপর বড় একটা ব্রিজের এক প্রান্তে বড় একটা বাংকারে কয়েকজন রাজাকার থাকতো। ওরা এখানে মা-বোনদের এনে সম্ভ্রমহানি করতো। আমরা জানতে পেরে স্থানীয়দের সহযোগিতা নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে বাংকার থেকে একজন বীরাঙ্গনা ও বেশকিছু গোলাবারুদসহ দুইটি রাইফেল উদ্ধার করি। আমাদের আক্রমণে রাজাকাররা ঐ এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। আর আমরা এভাবেই ধাপে ধাপে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই। অর্জিত হয় বাঙালির দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন, আমাদের স্বাধীনতা।

স্মৃতিকথন-৫৪

সংস্থার নামঃ টিএমএসএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ শিবগঞ্জ ইউনিয়ন, শিবগঞ্জ, বগুড়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার ভারতের আওতাধীন কুরমাইল, মালঞ্চা, পশ্চিম দিনাজপুর ক্যাম্পে প্রশিক্ষক মেজর (অবঃ) আবু তাহের সরদারের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে ০৭নং

সেক্টরের অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ২৫শে আগস্ট ১৯৭১ প্রথম গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য অপারেশনের মধ্যে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া থানার ধাপেরহাট নামক স্থানে মুখোমুখি যুদ্ধে পাকসেনাদের হতাহত করে ধাপেরহাট এলাকা শত্রুমুক্ত করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের একজন সহযোদ্ধা হাফিজার রহমান খান সেনাদের গুলিতে শহিদ হন। পরবর্তীকালে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার কিচক এলাকা এবং জয়পুরহাট জেলার কালাই থানার পুনট এলাকা শত্রুমুক্ত করি। এছাড়াও শিবগঞ্জ থানার তৎকালীন তফসিল অফিস ঘরে স্থায়ী ক্যাম্প করে দীর্ঘ ১৫ দিন যাবৎ সম্মুখযুদ্ধ শেষে থানা শত্রুমুক্ত করি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি দখলদারিত্ব থেকে দেশকে স্বাধীন করতে পেরে আমি আজও গর্ব অনুভব করি।

স্মৃতিকথন-৫৫

সংস্থার নাম: টিএমএসএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: টেংরা, রাজনগর, মৌলভীবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা রাম লাল রাজভর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ০৭ মার্চের ভাষণে সাড়া দিয়ে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সাব-সেক্টর কমান্ডার মাহবুবর উফ সাদীসহ আমাদের ৬০ জনের একটি দল ছিলো। আমরা ০৮ নভেম্বর ০৪ নং সেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার জালালপুরকে শত্রুমুক্ত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পটি ছিলো জালালপুরের সম্মুখভাগে। সাব-সেক্টর কমান্ডার মাহবুবর উফ সাদীর নির্দেশে ০৯ নভেম্বর রাতে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে বারবার গুলিবর্ষণ করি। আমাদের অবস্থান টের পেয়ে পাকবাহিনী বাংকারের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এভাবে প্রথম রাত অতিবাহিত হয়। পরদিন সকালে হানাদার বাহিনী আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা গ্রামের সকল বাড়িতে তল্লাশি চালায় মুক্তিবাহিনীকে ধরার জন্য। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন চলে গেলে পাকবাহিনী কিছুটা শান্ত হয়। আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি মোতাবেক আমরা ১৩ নভেম্বর রাতে আবার

জালালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শত্রুপক্ষের একটি গুলি আমার ডান পায়ে লাগে। যার ক্ষত চিহ্ন আমি আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। এইদিন পাকবাহিনীর ৪ জন সদস্য নিহত হয় এবং বাকি সৈন্যরা আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সকলের প্রচেষ্টায় আমরা ওইদিন রাতে জালালপুর ঘাঁটি শত্রুমুক্ত করি।

স্মৃতিকথন-৫৬

সংস্থার নাম: টিএমএসএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: তাড়ল, দিরাই, সুনামগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সামছুল আলম

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অন্যান্য অনেক পরিবারের সাথে আমি ও আমার পরিবার ভারতে আশ্রয় নেই। তখন বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য আমার মতো ২৫/২৬ বছর বয়সি অনেক যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিতে যেতো। এমন সময় আমিও সিদ্ধান্ত নেই প্রশিক্ষণ নেয়ার। বাবা-মায়ের সাথে কথা বলে জীবনের মায়া ত্যাগ করে নিজ মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে মুক্তিযুদ্ধের সময় মেঘালয় রাজ্যের বালাট থানার অধীনে সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলী ও সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর মোতালেব-এর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে মেঘালয় রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে আমাদের দল সুনামগঞ্জ জেলার বর্তমান তাহিরপুর উপজেলায় প্রবেশ করি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করি। আমরা শপথ নেই যে, শত্রুবাহিনীকে তাহিরপুরে কখনও প্রবেশ করতে দেবো না। একদিন সকাল বেলা খবর আসে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করার জন্য সুনামগঞ্জ থেকে ট্রলারযোগে শনির হাওরের মধ্য দিয়ে তাহিরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করার জন্য শনির হাওরে অবস্থান গ্রহণ করি। আনুমানিক দুপুর ২টার সময় শনির হাওরে ট্রলার আসার পথে পাকিস্তানিদের

সাথে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয়। পাক সৈন্যদের ট্রলারকে লক্ষ্য করে আমরা ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটাই। অল্পের জন্য পাকিস্তানি সৈন্য বহনকারী ট্রলারটি রক্ষা পায়। উপায় না পেয়ে পাকবাহিনী পিছু হটে যায় এবং তাদের পূর্বের ক্যাম্প সুনামগঞ্জে ফিরে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ প্রতিরোধের ফলে তাহিরপুরে পাকসেনারা প্রবেশ করতে পারেনি।

স্মৃতিকথন-৫৭

সংস্থার নাম: টিএমএসএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: তেতলী, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলকাছ আলী

আমি এবং আমার ভাই মোঃ বাদশা মিয়া ১৯৭১ সনে সিলেট রাজা জি সি উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম। ২৫শে মার্চ কালরাত্রির ঘটনাবলী ও নির্বিচার হত্যার প্রতিবাদ করার জন্য আমি ও আমার ভাই পরিবারের কাউকে না জানিয়েই ১০ এপ্রিল ১০/১৫ জনকে সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারতের দিকে রওনা দেই। পথিমধ্যে ফেঞ্চুগঞ্জে মাহতাব মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ১২ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭.০০টার সময় লাতুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি। পরে লাতুর হতে গাড়িযোগে করিমগঞ্জ টাউন হলে যাই। সেখানে আমরা মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম লিখাই। টাউন হলে কয়েক দিন থাকার পর আমাদের সাথীরা সকলেই আমাদের দুইজনকে রেখে পালিয়ে আসে। তখন আমাদের দুইজনকে টাউন হলের আরও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে লোহারবন্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছে পরের দিন হতে প্রশিক্ষণ শুরু করলাম এবং সেখানে এক মাস প্রশিক্ষণ নিলাম। কৈলাশ থেকে আসার পর আমাদের সাথে পাকহানাদার বাহিনীর প্রথম যুদ্ধ হয় আলীনগর বিওপিতে। পরে যুদ্ধ করি চাতলা বিওপি এবং বিআইডিসি এলাকায়। তারপর শমসেরনগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার এলাকায় আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমাদের ডিফেন্স ছিলো নমোজা গ্রামের পাশে নদীর পাড়ে চাতলা বিওপির পাশে। আমার ভাই বাদশা

মিয়াসহ আমরা ১৪ই আগস্ট তারিখে প্লাটুন কমান্ডার মুহিবুর রহমানের সাথে শমসেরনগর এলাকায় মনুব্রিজ ভাঙ্গতে যাই। তখন রাত প্রায় তিনটা। আমাদের সাথে এ সময় পাকহানাদার বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে রেনু মিয়া নামক এক মুক্তিযোদ্ধা আহত হয় এবং অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পে এসে জানান বাদশা মিয়ার ওপরে ব্রাশফায়ার হয়েছে এবং তিনি শহিদ হয়েছেন। মুজিবুর রহমান নামে আরও একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাকহানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এ খবর শুনে ক্যাম্প কমান্ডার আমার নিকট হতে বাদশা মিয়ার ব্যবহৃত বেডিং ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নিয়ে যান এবং মাছিমপুর হেড কোয়ার্টারে শহিদ তালিকায় জমা দেন। ক্যাম্পের সকল মুক্তিযোদ্ধা টাকা তুলে ৪ দিনের জন্য সিন্নী ও মিলাদ মাহফিল করার প্রস্তুতি নেয়। দুই হাঁড়ি সিন্নী রান্না হয়েছে এমন সময় বাদশা মিয়া আল্লাহর মেহেরবানীতে ক্যাম্পে উপস্থিত হন এবং তা দেখে মুক্তিযোদ্ধারা অবাক হন। বাদশা মিয়ার নিকট হতে জানতে পারি ব্রাশ ফায়ারের বুলেট তার মাথার উপরিভাগে লাগে। তিনি তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন এবং জ্ঞান ফেরার পর তিনি কেওলাকান্দি আশিক মিয়ার বাড়িতে আহত অবস্থায় আশ্রয় নেন। তার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আশিক মিয়ার মা গ্রামের ঔষধি গাছের পাতা দিয়ে মাথা বেঁধে দেন এবং ক্যাম্পে আসার পর তাকে চিকিৎসা করানো হয়। হাসপাতালে কয়েকদিন থাকার পর আবারও আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং ফেঞ্চুগঞ্জ পিআইডিসি যা বর্তমান বিআইডিসি-তে রাখি। আমরা মৌলভীবাজারের শেরপুরে ডিফেন্সে থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং আমাদেরকে মৌলভীবাজার গার্লস স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। মৌলভীবাজার গার্লস স্কুলে লেঃ ওয়াকিব জামান-এর নিকট আমরা দুই ভাই আমাদের ব্যবহৃত স্টেনগান ও এমএলআর জমা দেই। এরপর বিদায় নিয়ে বাড়িতে এসে দেখি, আমাদের ঘরবাড়ি পাকহানাদার বাহিনী জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তারপরও মুক্তির আনন্দে বুকটা ভরে যায়, আমি গর্বিত, আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

স্মৃতিকথন-৫৮

সংস্থার নাম: টিএমএসএস

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: উত্তরভাগ, রাজনগর, মৌলভীবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী অজয় কুমার দাস

দিনটি ছিলো রবিবার, ভোর পাঁচটা। আমরা তখন সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। আমাদের সাত বন্ধুর রওনা দেয়ার কথা ভারতের করিমগঞ্জে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ পাশের বাড়ির চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। হুড়মুড় করে উঠে গিয়ে দেখি ওরাচংকে হানাদার বাহিনী টেনে-হিঁচড়ে তাদের ক্যাম্পের দিকে নিয়ে গেছে। খবর নিয়ে জানা যায়, আমাদের মুক্তি বাহিনীতে যাবার খবর ক্যাম্পে জানিয়েছিলো এলাকার উস্তার মাতব্বর। লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতেই শুনতে পাই ওরাচং-এর গগনবিদারী আর্ত চিৎকার। তাকে ডালের সাথে ঝুলানো হয়েছে, পা দুটি ওপরে। আমাদের বাকিদের নামগুলো জানার জন্য তাকে গরম পানির ছিটা ও গরম খুন্তির ছ্যাকা দেয়া হচ্ছে। অত্যাচারে অজ্ঞান হয়ে গেছে ওরাচং। তার কাছ থেকে কোন তথ্য না পেয়ে পাকবাহিনী কয়েকটি বুলেটে ঝাঁঝরা করল ওরাচং-এর বুক। সবকিছু শান্ত ও নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। আমরা রওনা দিলাম ভারতের করিমগঞ্জে। বুকে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ওরাচং-এর রক্তের বদলা আমাদের নিতেই হবে। রণাঙ্গনে আমাদের আরো বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু, অমানুষিক অত্যাচারের পরও ওরাচং-এর হার না মানা মানসিকতাই আমার মনে গভীর দাগ কেটে গেছে যা আমি চাইলেও ভুলতে পারবো না।

স্মৃতিকথন-৫৯

সংস্থার নাম: সিসিডিএ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: দক্ষিণ ইলিয়টগঞ্জ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আঃ ছাত্তার

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বি-বাড়িয়া জেলার কসবা থানার

বিজয়পুর এলাকায় খালদার নদীর পাড়ে যুদ্ধ করি। আমরা আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৩ জনের একটি টিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প দখল করার জন্য সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত যুদ্ধ করি। সারাদিন কাদা ও পানির মধ্যে থেকে যুদ্ধ করি। আমার কপাল ভালো যে সেদিন বড় কোন দুর্ঘটনায় পড়ি নাই। সেদিন আমার হাত ঘেঁষে একটি গুলি চলে যায়। গুরুতর কোন ক্ষতি না হলেও আমাকে বেশ জখম করেছিলো। আমরা সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলাম। আমাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন ক্যাপ্টেন দিদারুল আলম। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কুমিল্লা জেলার তিতাস থানার বাতাকান্দি এলাকায় যুদ্ধ করার সময় আমরা বেশ কয়েকজন জন পাকসেনা হত্যা করি। এভাবে শত প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করি।

স্মৃতিকথন-৬০

সংস্থার নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সীমান্ত, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম

১৯৭১ সালের মার্চে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আমি ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্রসহ বাংলাদেশে আগমন করি এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান করি। বাংলাদেশে এসে আমি ও আমার দলের সদস্যরা দৃঢ় মনোবল নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করার মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করি। প্রথমে আমি ও আমার দলের ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলায় অবস্থিত দত্তনগর কৃষিফার্মে অবস্থানরত পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করি এবং এখানে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর অনেকে হতাহত হয়। ২৭ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে দত্তনগর কৃষিফার্ম থেকে পাক হানাদার বাহিনী পিছু হটে জীবননগর এসে অবস্থান করে। এই খবর জানতে পেরে আমরা জীবননগরের আশেপাশে অবস্থান করে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা যৌথভাবে পুনরায় পাক বাহিনীর ওপর

চারিদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করি। এ অবস্থায় পাক বাহিনী পিছু হটে জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামে অবস্থান নেয়। আমি ও আমার দলের মুক্তিযোদ্ধারা আবারও পাকবাহিনীকে ধাওয়া করি। সেদিনই সন্ধ্যা ৮.০০টার সময় মিত্রবাহিনীর মেজর বর্মন ভার্মার গাড়ি মনোহরপুর নামক গ্রামে আসে এবং আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তার সাথে অবস্থান করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশনা দেন। আবার সে রাতেই ভোরের দিকে উথ লীতে আমরা ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে পাকবাহিনীর সাথে ব্যাপক যুদ্ধ করি। এ সময় পাকবাহিনীর অনেক সদস্য মারা যায় এবং পাকবাহিনী পিছু হটে হিজলগাড়ী কেরু ফার্মের দিকে চলে যায়। ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে জীবননগর শহর পাকবাহিনীর নিকট হতে শত্রুমুক্ত হয় এবং আমরা আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ি।

স্মৃতিকথন-৬১

সংস্থার নামঃ ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বাঁকা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন

আমি মোঃ গোলাম হোসেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে আমি সংযুক্ত হই আর্মি, পুলিশ, ইপিআর এবং কিছু ছাত্র ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিফৌজে। আমি ভারতের পেট্রাপোলের কাঁঠালবাগান এলাকায় অবস্থান নেই। ১৯৭১ সালে জুনের শেষ দিকে আমাদের সেই সময়ের ক্যাপ্টেন তৌফিক ই ইলাহী চৌধুরীর নেতৃত্বে ২০-২৫ জনের একটি দল খগএ, ঝখজ, .৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড এবং ডিনামাইট নিয়ে সেখানকার পাকিস্তানি বাহিনীর একটি বিওপিতে আক্রমণ করি। আমাদের তীব্র আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে। আমরা ডিনামাইট দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিওপি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে আসি। এরপরও বিভিন্ন জায়গায় পাকহানাদার বাহিনীর সাথে আমরা সম্মুখ যুদ্ধ করেছি। সবকটি যুদ্ধেই আমরা জয়লাভ করেছি। সেদিনের সেই যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি মনে পড়লে আজও আনন্দে আত্মহারা হই। দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার সেই যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি আজও অমলিন।

স্মৃতিকথন-৬২

সংস্থার নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: পারকৃষ্ণপুর মদনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তমছের আলী

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মেহেরপুর জেলার ধর্মদহ নামক গ্রামে ডিফেন্সে থাকাকালীন পাকহানাদার বাহিনীর সহিত তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সম্মুখ যুদ্ধে তিনদিন গোলাগুলির পর কোম্পানির টু আই সি সুবেদার মজিদ মোল্লা, লেঃ নুরুন্নবী এবং ক্যাপ্টেন তৌফিক ই ইলাহির নির্দেশে পজিশনে চার্জ করা হয়। সেই যুদ্ধে পাকবাহিনীর বহু সেনা হতাহত হয়েছিলো। এর বিপরীতে আমাদের মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছিলেন। এছাড়া কাজীপুর, সাহেব নগর, তেঁতুলবাড়ীয়া, প্যারাগপুর, বেতবাড়ীয়া, তেকালাঘাট সহ বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিলো। পরিশেষে কুষ্টিয়ায় পৌঁছানোর পর যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। সে সময় আমাদের কোম্পানি কুষ্টিয়ায় অবস্থান নিয়ে থাকে। এর মধ্যে ধর্মদহ, সাহেবনগর ও কাজীপুরের যুদ্ধ আমার জীবনের সব চেয়ে বড় যুদ্ধ এবং স্মরণীয় ঘটনা। কারণ ধর্মদহ যুদ্ধে পাকবাহিনী যখন তিনদিক থেকে হামলা শুরু করে তখন আমরা আমাদের পজিশন থেকে ফায়ার করতে থাকি। এখানে অনেক পাকবাহিনী হতাহত হয়েছিলো। শেষে পাকবাহিনীর মর্টারের গোলার সামনে আমরা টিকতে না পেরে পজিশন ছেড়ে পিছনে এসে নদীর ধারে পজিশন নিই। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের আর্টিলারি হতে পজিশনে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে এবং অপর দিকে শত্রু পক্ষের আর্টিলারি আমাদের পজিশনে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ঠিক সেসময় পাকবাহিনী আমাদের পজিশনে ঢুকে পড়েছিলো। মিত্রবাহিনী ও আমাদের সম্মিলিত গোলাগুলি পাকবাহিনীর ওপর পড়লে পাকবাহিনী পরাস্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকা ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাত জন সদস্য পজিশন ছেড়ে পিছু আসার সময় রাস্তা ভুলে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। একবার সাহেব নগরের এক বাড়ির মধ্যে আমাদের প্লাটুন নিয়ে অবস্থান করছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকবাহিনী টের পেয়ে আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা করে। সেই যুদ্ধে আমাদের মধ্যে হাবিলদার সালামসহ আরও তিন জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়। গোলাগুলির মুখে আমরা টিকে থাকতে না পেরে পিছু হটে আসি। পরবর্তীকালে পাকবাহিনী শহিদ মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার সালামসহ তিন জনের লাশ পুড়িয়ে দেয় এবং একজনকে ধরে নিয়ে যায় এবং পরে তাকেও গুলি করে হত্যা করে। কাজীপুর যুদ্ধও আমার আরেক স্মরণীয় যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধে আমাদের কেউই হতাহত হয়নি তবে পাকহানাদার বাহিনীর প্রায় এক প্লাটুন সৈন্যকে আমরা হত্যা করতে সমর্থ হই। সেসময় আমি কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। একবার আমরা চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় আমার এলাকায় আসার চেষ্টা করি খাবার সংগ্রহের জন্য, খাবার সংগ্রহ করে ফেরার পথে আবারও পাকবাহিনীর অ্যামবুশের কবলে পড়ি। সেখানে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে এক প্লাটুন মুক্তিসেনার মধ্যে আমরা বেঁচেছিলাম মাত্র ৬ জন। পরবর্তীকালে আমি ভারতের মাজদিয়া বিহার থেকে ২৩ দিন উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এরপর ক্যাপ্টেন তৌফিক ই ইলাহির নেতৃত্বে শিকারপুর এ্যাকশান ক্যাম্পে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করি। অবশেষে আমারা পাকবাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে শত্রমুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হই।

স্মৃতিকথন-৬৩

সংস্থার নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: জামির্ত্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ সিরাজুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি ও আমার কমান্ডারসহ ক্যাপ্টেন আঃ হালিমের নির্দেশে ২০ জনের একটি দল বালিরটেক এলাকায় একটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। সেখানে পাকবাহিনীর সদস্যরা অসংখ্য গোলাবারুদ ও অস্ত্র নিয়ে অবস্থান করে। আমরা ২০ জন আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে

পাকবাহিনীর ক্যাম্প চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলি এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে পাকবাহিনীকে পরাস্ত করার মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করি। প্রথমে আমরা হানাদার বাহিনীর ওপর হামলা করি। পরবর্তীকালে তারাও গুলি চালাতে থাকে। সেখানে আমাদের ২০ জন যোদ্ধার মধ্যে দুই জন আহত হয় কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর অনেকেই আহত ও নিহত হয়। আমাদের এমন আকস্মিক আক্রমণের কারণে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই অপারেশনে আমরা সাফল্য অর্জন করি। এরকম ৫ থেকে ৭টি অপারেশনে আমি অংশগ্রহণ করি। পরবর্তীকালে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে মানিকগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর ১৩ই ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ হানাদারমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন করি এবং ১৫ দিনব্যাপী বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করে।

স্মৃতিকথন-৬৪

সংস্থার নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: উথলী, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন আমাদের এলাকা আক্রমণ করে তখন আমি টগবগে যুবক। ১৯৭১ সালে ২৯শে নভেম্বর উথলী গ্রামে সম্মুখ সমরে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি। সে যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং যৌথ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা উভয় পক্ষই ট্যাংক ব্যবহার করে। উক্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৫ জন সৈনিক মৃত্যুবরণ করে এবং যৌথবাহিনীর অনেক সৈনিক শহিদ হন। যুদ্ধ এক সময় শেষ হয়ে যায় কিন্তু যুদ্ধ শেষে আমার বাবা-মাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এই ঘটনায় আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। অবশ্য কয়েকদিন পর তাদেরকে আমি খুঁজে পাই। মুক্তিযুদ্ধকালীন এই ঘটনাটি আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কষ্টের ঘটনা। সেই সময়ের প্রত্যেকটি ঘটনা আজও হৃদয়কে নাড়া দেয়।

স্মৃতিকথন-৬৫

সংস্থার নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কেডিকে, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ লুৎফর রহমান

আমি মোঃ লুৎফর রহমান। আমাদের ক্যাম্প ছিলো মাজদিয়া ইয়ুথ ক্যাম্প। আমি প্রতিদিন রাতে ক্যাম্প থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড, বোমা ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট সরবরাহ করতাম এবং রাতেই ক্যাম্পে ফিরে যেতাম। একদিন গ্রেনেড নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে শুনতে পেলাম আমাদের গ্রামের পাশের গ্রাম আন্দুলবাড়িয়াতে এক রাজাকার (নাম স্মরণে আসছে না) অবস্থান করছে এবং তাকে আটকের পরিকল্পনা চলছে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে। আমি আর সে রাতে ক্যাম্পে না ফিরে রাজাকার আটক করার দলে অংশ নেই এবং আমরা তাকে আটকাতে সক্ষম হই। তাকে আটক করে গ্রামে নিয়ে আসি। গ্রামে এসে পরিবারের সাথে দেখা করতে খুব ইচ্ছা করে আবার ভয়ও করে কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে বিপদ হতে পারে। যেহেতু আমি দিনে থাকতাম না তাই সচরাচর পরিবারের সাথে দেখা করার কোন সুযোগও ছিলো না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অশেষ মেহেরবানিতে পরিবারের সাথে দেখা করতে পেরেছিলাম এবং এতে কোন বিপদ হয়নি। সহি-সালামতে পরিবারের সাথে দেখা করে আবার ক্যাম্পে ফিরে যাই। এভাবে দিনের পর দিন ক্যাম্প থেকে গ্রেনেড, বোমা সরবরাহ ও সরাসরি যুদ্ধ করে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছি।

স্মৃতিকথন-৬৬

সংস্থার নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মনোহরপুর, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ বদর উদ্দীন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। আমরা বুলতলা গ্রামে আশ্রয়ে আছি। হঠাৎ কী মনে হলো আন্দুলবাড়ীয়া বাজারের আল্লা রাখার চায়ের দোকানে বসে

এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেয়ার প্রয়োজন বোধ হলো। দ্রুত আমার এক নানাকে সাথে নিয়ে অতি সাবধানে চায়ের দোকানে গিয়ে বসি। সকালে প্রতিদিন এখানে বিরাট মজলিস বসে। আমি চুপচাপ বসে থেকে এখানকার মানুষের মধ্যে হতাশা লক্ষ করি। তারা বলে-'পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্যাম্প করেছে। মুক্তিফৌজের দেখা নেই, এদেশ স্বাধীন হবে না'। বিষয়টি আমাকে ভীষণ আহত করে। ওখান থেকে ফিরে বানপুর অপারেশন ক্যাম্পে ৮নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে দেখা করি। তিনি সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ মঞ্জুরের সাথে দেখা করার পরামর্শ দেন। আমি মেজর মঞ্জুরের সাথে দেখা করি। তিনি আমার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তারপর আমি কি করতে চাই সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন। আমি তাকে জীবননগরের ৫টি পাক-আর্মি ক্যাম্পে একযোগে একই সময়ে আক্রমণের প্রস্তাব দিই এবং এজন্য ৫টি এলএমজি, ৫টি রকেট লঞ্চার ও ৩০টি হ্যান্ড গ্রেনেড দিতে অনুরোধ করি। তিনি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে ওয়ারল্যাসে ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমানকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের নির্দেশ দেন। সম্ভবত অক্টোবরের ৮ বা ১০ তারিখ রাত ১২:০১ মিনিটে আমরা ২৫ জনের একটি দল ৫টি উপদলে বিভক্ত হয়ে একযোগে জীবননগর, আন্দুলবাড়ীয়া, হাসাদাহ, উথলী ও সাবদালপুরের পাক-ক্যাম্পে আক্রমণ করি। চারিদিকে কম্পন শুরু হয়। আমরা অপারেশন সফল করে সুটিয়া গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা মোশারফ হোসেন মিয়াদের বাড়ি ফিরে আসি। সেখান থেকে গুড়দা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র আজিজের বাড়ি যাই। পরদিন সকালে নাস্তা করে আমি কোমরে ৩টি হ্যান্ড গ্রেনেড গুজে জীবননগর থেকে একটি বাইসাইকেল নিয়ে একাই আগের দিন পরিচালিত অপারেশনের গ্রামগুলো ঘুরে দেখি। এবারের চিত্র ভিন্ন, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। সবাই বলাবলি করছে দেশ স্বাধীন হবেই। এই সকল মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং আমার মত লাখো মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়। আজো সেই দিনগুলি আমার স্মৃতিতে ভাসে। এবছর মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হলো। এই স্বাধীনতার সুফল যেন বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় সেই কামনা করি।

স্মৃতিকথন-৬৭

সংস্থার নাম: রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: গদাইপুর, পাইকগাছা, খুলনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোসলেম আলী মোড়ল

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে হাতিয়ারডাঙ্গার বাছারবাড়ি ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাঁকা (শহিদ কামরুল) ক্যাম্পে যোগদান করি। কমান্ডার স. ম বাবর আলী ও ক্যাম্প কমান্ডার আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ দক্ষিণ খুলনার সকল ক্যাম্প কমান্ডাররা লাডুলিতে একত্রিত হন এবং আমাদের এলাকা রাজাকারমুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ৭-৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজাকারদের সাথে আমাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অনেক রাজাকার আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরে গণআদালতের মাধ্যমে তাদের বিচার নিশ্চিত করা হয়। সেই যুদ্ধে দুই জন মুক্তিযোদ্ধা আনসার ও আনোয়ার শহিদ হন। আহত হন বীর মুক্তিযোদ্ধা তোরাব, খালেক, খালিদ গাজী ও রুহুল আমীন। এই যুদ্ধে জয়ের ফলে কপিলমুনি এলাকা রাজাকার ঘাঁটি মুক্ত হয়। কপিলমুনি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে দক্ষিণে আর কোন বাধা না থাকায় আমরা বারোহাড়িয়া, মাইলমারা, বটিয়াঘাটার কাছে অবস্থান গ্রহণ করি। রাত্রে চকরাখালি হাইস্কুল ভবন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করি। কমান্ডার আবুল কালাম আজাদ ও কমান্ডার শাহাদাৎ হোসেন বাচ্চুর নেতৃত্বে আমরা খুলনার উদ্দেশ্যে লেফটেন্যান্ট আরেফিন, মেজর জয়নাল আবেদিন, রহমতউল্লাহ দাদু (বীর প্রতীক) কামরুজ্জামান টুকু, স.ম. বাবর আলীসহ লঞ্চযোগে রওনা হই। খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে আমাদের লঞ্চ লক্ষ্য করে লাগাতার গুলিবর্ষণ করা হয়। পরে খুলনা ফরেস্ট ঘাট থেকেও পাকিস্তানি আর্মি আমাদের লঞ্চ আক্রমণ করে। তাৎক্ষণিকভাবে দুই জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। পরে মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে যাতে পাকবাহিনীকে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং তারা দিশেহারা হয়ে ১১টার সময় আত্মসমর্পণ করে। মেজর জয়নাল আবেদিন, খিজির ভাই ও বাবর ভাইয়ের নেতৃত্বে খুলনা জেলার সকল মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

স্মৃতিকথন-৬৮

সংস্থার নাম: রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: হাসাদাহ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনির উদ্দিন

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনির উদ্দিন। আমার সহযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধদিনের সেই স্মৃতিগুলো স্পষ্ট মনে করতে পারি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবননগর উপজেলার উথলীতে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাক হানাদার বাহিনীর সদস্যরা আমাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এই অবস্থায় মনোবল না হারিয়ে বুক চিতিয়ে আমরাও পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। তাদেরকে হত্যা করে আমরা আমাদের এলাকাকে শত্রুমুক্ত করি। পাক হানাদার বাহিনীকে ঘায়েল করতে আমরা বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিই, যাতে তারা আমাদের এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে শত্রুর সাথে সামনে থেকে লড়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি সত্যিই অত্যন্ত গর্বিত।

স্মৃতিকথন-৬৯

সংস্থার নাম: রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: আন্দুলবাড়ীয়া, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ বজলুর রহমান

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ বজলুর রহমান। যুদ্ধকালীন ঝিনাইদহ জেলার দত্তনগরে অবস্থিত কৈত্তের খাল নামক একটি স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি। খালের ওপারে পাকহানাদার বাহিনী আর এপারে আমরা মোঃ বজলুর রহমান-এর মুক্তিবাহিনীর দল। পাক হানাদার বাহিনীর সাথে এখানে আমরা কঠিন যুদ্ধ চালাই। গুলি আর পাল্টা গুলি। একপর্যায়ে পাকবাহিনীর সদস্যরা টিকতে না পেরে পিছু হটে এবং সেই এলাকা ত্যাগ করে। যুদ্ধের সময়ে আমরা সকলে মিলে ঝিনাইদহে অবস্থিত মান্দারবাড়ীয়া

ব্রিজ ভেঙে ফেলি যাতে পাক বাহিনীর সদস্যরা কুষ্টিয়া হয়ে ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গায় আসতে না পারে। চুয়াডাঙ্গার উথলীতে আমরা রেললাইন উড়িয়ে দিই যাতে পাক হানাদার বাহিনী ট্রেনে চলাচল করতে না পারে। এভাবে নানা বাধার সৃষ্টি করে ও সরাসরি যুদ্ধ করে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি এই জন্য যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন দেখে যেতে পারছি।

স্মৃতিকথন-৭০

সংস্থার নাম: রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: রায়পুর, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আয়ুব আলি শেখ

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আয়ুব আলী শেখ। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে আমার এক সহযোদ্ধা আমার সামনে শহিদ হয়ে যান। সেই স্মৃতি মনে পড়লে শরীরে আজও শিহরণ জাগে। ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে আমরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। ঝিনাইদহ জেলার দত্তনগরে একবার পাকহানাদার বাহিনীর সাথে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। গুলি করতে করতে আমরা এগোতে থাকি। পাকহানাদার বাহিনীও গুলি করতে থাকে। কিন্তু আমাদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাকহানাদার বাহিনী টিকে থাকতে পারেনি। পরবর্তীকালে তারা পিছু হটলে আমরা সেই এলাকা দখল নেই। সেদিনের স্মৃতি মনে পড়লে আজও কাতর হয়ে যাই। জীবন বাজি রেখে আমরা আমাদের মাতৃ-ভূমিকে স্বাধীন করেছি। তাই যেকোন মূল্যে আমাদের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে সকলকে যার যার জায়গা থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

স্মৃতিকথন-৭১

সংস্থার নাম: সৃজনী ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: পান্তাপাড়া, মহেশপুর, ঝিনাইদহ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু তালেব বিশ্বাস

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকের ঘটনা। আমরা মহেশপুর থানার পাশের গ্রাম মুড়তলা ও নাটিমা গ্রামে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। আমরা ৪০/৪৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। ভোর হতে অবিরাম গোলাগুলি শুরু হয়। আমরা সবাই একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সবাইকে পানি পান করতে সাহায্য করছিলো। এমন সময় একটি গুলি এসে তার বুকে লাগলো। সাথে সাথে সে মারা গেলো। আমরা কোন উপায়ন্তর না পেয়ে সেখানেই তাকে মাটি চাপা দিয়ে কবর দিই। গোলাগুলি অবিরাম চলছেই। এভাবে গোলাগুলি চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। হঠাৎ পাকবাহিনীর পক্ষ হতে গুলি চালানো বন্ধ হয়ে গেলো। আমরা ভাবলাম পাকসেনারা চলে গেছে। আমাদের কমান্ডার মহেশপুর অবস্থান করছিলেন। তাকে আসার জন্য খবর দেওয়া হলো। তিনি এসে আমাদের সাথে দেখা করলেন এবং পাকবাহিনীর অবস্থান জানতে চাইলেন। আমি এবং কয়েকজন পাকবাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম তারা পাশের ভাঙ্গা কবরস্থান ও আম গাছের আড়াল থেকে যুদ্ধ করছিলো। সেখানে গিয়ে দেখি কোন পাকসেনা নেই। দুইজন লোক ঘোরাঘুরি করছিলো। সাথে সাথে আমরা অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের খবর দেই। তারা এসে এই দুইজনকে ধরে ফেলে এবং কমান্ডার তাদের সাথে আলাপ করে বুঝতে পারেন যে তারা পাকসেনার গুপ্তচর। কমান্ডার নির্দেশ দিলেন এদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তখন আমরা ওই দুই জনকে নিয়ে পাশের গ্রামে সন্তার বাঁওড়ে গেলাম এবং পানিতে নামিয়ে গুলি করা হয়। আমরা সকলে ফিরে আসলাম বটে কিন্তু আজও সাথী হারানোর কথা মনে পড়লে অনেক কষ্ট লাগে। এরকম অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছি।

স্মৃতিকথন-৭২

সংস্থার নাম: শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মজিদপুর, তিতাস, কুমিল্লা

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফুল্ল কুমার ভৌমিক

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একদিন পাক হানাদার বাহিনীর একটি দল সিলেট শহর থেকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছিলো। জায়গাটা ছিলো সিলেট ও কুমিল্লা বর্ডার এলাকা। এসময় তাদের ফোর্স সংখ্যা ছিলো ৫ জন এবং গাড়ির ড্রাইভার। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আসার খবর জানতে পারলো। সে অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীর দল পাকবাহিনীর গতিপথ রোধ করার জন্য একটা ছক কষে অপেক্ষা করতে লাগলো। যেপথে পাকবাহিনী আসবে সেই পথে মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে ঘাঁটি করে বসে থাকলো। যখন পাকবাহিনীর গাড়ি মুক্তিবাহিনীর কাছাকাছি আসলো সাথে সাথে মুক্তিবাহিনীর সকল সদস্যরা পাকবাহিনীর গাড়িকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো এবং পাকবাহিনীর সকল সদস্যদের গাড়ি থেকে নেমে আত্মসমর্পণ করার জন্য নির্দেশ দিতে লাগলো। এ অবস্থায় পাকবাহিনীর সদস্যরা আত্মসমর্পণ করতে গড়িমসি করতে লাগলো। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার মেজর নাসিম সাহেব বারবার তাদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিলো। এক পর্যায়ে পাকহানাদার বাহিনীর সেনারা আত্মসমর্পণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে মুক্তিবাহিনী তাদের কথায় বিশ্বাস করে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ করে দিলো। এমন সময় মুক্তিযোদ্ধারা কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাকবাহিনীর মধ্য থেকে আত্মসমর্পণ করা অবস্থায় হঠাৎ করে একজন গুলি ছুড়তে শুরু করলো। সেই গুলি আমাদের মেজর সাহেবের পায়ে লাগলো। তাৎক্ষণিক মেজর সাহেবকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা সামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং পরবর্তীকালে মেজর সুবিদ আলী ভূঁইয়া মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতৃত্ব দেন। তারপর পাকবাহিনীর সকল সদস্যকে আটক করে কুমিল্লা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাকহানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে শত বিপদ মাথায় নিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি।

স্মৃতিকথন-৭৩

সংস্থার নাম: দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ধানসিঁড়ি, কবিরহাট, নোয়াখালী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুর রব

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকবাহিনী সারা দেশে আক্রমণ চালালে আমি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ১নং সেক্টরের বিভিন্ন ইউনিটে সম্পৃক্ত হই। চট্টগ্রামে অবস্থিত কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। চট্টগ্রাম শহর পাকসেনারা পুনঃদখল করলে আমি নদী পথে হাতিয়া ফিরে আসি। হাতিয়া মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার মোঃ রফিকুল আলমের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্থানীয় ইউনিটসমূহের সাথে যোগ দেই। চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি হওয়ায় হাতিয়া থানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাকবাহিনী চট্টগ্রাম হতে ঢাকা যাওয়ার জন্য সড়ক পথ ব্যবহার করতে না পারায় সমুদ্র পথে হাতিয়া-সন্দ্বীপ চ্যানেল ব্যবহার করে বরিশাল ও ঢাকায় সৈন্য ও রসদপত্র সরবরাহের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। মুক্তিবাহিনী নদীতে অবস্থিত বয়াসমূহ ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে পাকবাহিনীর নদী পথে চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে তারা ১৯৭১ সালের ১০ মে হাতিয়া থানা আক্রমণ করে। শত্রুদের এক কোম্পানি সৈন্য হাতিয়া দ্বীপে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন ও গণহত্যা চালায়। একই সাথে পাকবাহিনী হাতিয়া থানায় রাজাকার বাহিনী গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। জুন মাসে আমি হাতিয়া থেকে নৌকায় চড়ে মেঘনা নদী পার হয়ে নোয়াখালী আসি এবং চার দিন ধরে ২০০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে ফেনী, কানকিরহাট হয়ে ভারতের আগরতলায় পৌঁছাই। সেখানে মুক্তিবাহিনীর জন্য নির্ধারিত যমুনা ক্যাম্পে ০২ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে হাতিয়া ফিরে হাতিয়া থানা মুক্তিবাহিনীর নিকট রিপোর্ট করি। ৩১ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ এক গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে হাতিয়া থানাকে পাক-হানাদার বাহিনীর থেকে মুক্ত করি। হাতিয়া নোয়াখালী জেলার প্রথম থানা যা ৩০ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলমের নেতৃত্বে শত্রুমুক্ত ঘোষণা করা হয়। সেদিন হতে আমাদের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত পাকহানাদার বাহিনী আর হাতিয়ার মাটিতে পা রাখতে সক্ষম হয়নি। জয় বাংলা।

স্মৃতিকথন-৭৪

সংস্থার নামঃ দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ নিঝুমদ্বীপ, হাতিয়া, নোয়াখালী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফজলুল করিম

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে পাক হানাদার বাহিনী সারা দেশে আক্রমণ চালালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি ঘরে আর নিশ্চুপ বসে থাকতে পারিনি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ২নং সেক্টরের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনমাফিক অপারেশন পরিচালনা করার জন্য আমার দায়িত্ব ছিলো ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ভাইদের মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত করানো। ৩১ অক্টোবর ১৯৭১ সালে এক গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে হাতিয়া থানাকে পাকহানাদার মুক্ত করার যুদ্ধে আমিও সম্পৃক্ত ছিলাম।

৩০ জানুয়ারি ১৯৭২ ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর নিকট অস্ত্র জমা দেয়ার জন্য হাতিয়া হতে একটি সমুদ্রগামী জাহাজ মনিরুল হকে উঠে হাতিয়া ও রামগতি হতে প্রায় ৩ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধাকে অস্ত্রসহ সাথে নিয়ে দীর্ঘ দুই দিন দুই রাত জাহাজে অবস্থান করার পর সকালে আমরা ঢাকা পৌঁছাই। সেদিন সকাল ১১.০০টায় বঙ্গবন্ধুর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করার দৃশ্য আমার জীবনের অন্যতম একটি স্মরণীয় ঘটনা। একসাথে এতো অস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধা দেখে আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম। কমান্ডারের নির্দেশে আমাদের থাকার জায়গা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে। একই দিন তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, আ.স.ম আব্দুর রব, শেখ ফজলুল হক মণি, নূরে আলম সিদ্দিকীসহ হাজারো দেশবরেণ্য নেতাদের সাথে বঙ্গবন্ধুকে স্বচক্ষে দেখে আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। অস্ত্র জমা দেয়ার অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু সকল মুক্তিবাহিনীর প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন আজও আমি সেই কাজে সম্পৃক্ত আছি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারবো না, না করতে পারবো কর্মসংস্থান না দিতে পারবো কোনো চাকরি। তোমরা দেশ স্বাধীন করেছো, দেশের উন্নয়নে তোমাদেরই কাজ করতে হবে, পল্লীতে ফিরে যাও এবং কৃষিকাজে মনোনিবেশ করো।"

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের প্রাক্কালে আমি এই প্রজন্মকে জানাতে চাই -- আমি বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বান এখনও শুনতে পাই। আমি নিঝুমদ্বীপে কৃষিকাজে আজও সম্পৃক্ত আছি।

স্মৃতিকথন-৭৫

সংস্থার নাম: দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: হাতিয়া, নোয়াখালী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম

২৯ অক্টোবর ১৯৭১। রাত ১২.০১ মিনিট। ৭ নম্বর সামুদ্রিক বিপদ সংকেত। অন্ধকার রাত বজ্র ও বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বাড়ছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন হাতিয়া থানা কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমার প্রথম আক্রমণ। অপারেশনের জন্য বাছাই করা ৪৭ জন গেরিলা যোদ্ধার সাথে সহযোগিতার জন্য সম্পৃক্ত হলেন ৮ম বেঙ্গলের আরও ১২ জন সেনা। শতাধিক রাজাকার ও মিলিশিয়া ইতোমধ্যে পাকবাহিনী হতে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কমান্ডারদের সাথে যৌথ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী থানা আক্রমণ করলাম। বৃষ্টির মত গোলা বর্ষণের পর শতাধিক সশস্ত্র রাজাকার ও মিলিশিয়া আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। প্রচুর রাইফেল, গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। হাতিয়া থানাকে নোয়াখালী জেলার প্রথম শত্রুমুক্ত থানা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ৩১ অক্টোবর ১৯৭১ পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত পতাকা উত্তোলিত হল সমগ্র দ্বীপ জুড়ে।

৬ নভেম্বর ১৯৭১ শত্রুপক্ষের দুইটি বোমারু বিমান আমাদের ক্যাম্পের খুব কাছে দিয়ে উড়ে যায়। বার বার চক্কর মেরে বোমা ফেলতে থাকে। হাতিয়া বন্দরে নোঙ্গর করা মুক্তিবাহিনীর একটি তেলবাহী জাহাজে মুহূর্তেই আগুন ধরে যায়। মুক্তিবাহিনীর এলএমজি ও রকেট লঞ্চার দিয়ে পাল্টা আক্রমণের কারণে ঘাতক বোমারু বিমানগুলো দ্রুত পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর হাতিয়া দ্বীপের মুক্ত মাটিতে আর কখনও দখলদার গোষ্ঠী আক্রমণ চালাতে পারেনি।

১ নভেম্বর ১৯৭১ সাল হতে হাতিয়া থানার আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক

দায়িত্ব হাতে নেয় মুক্তিবাহিনী। হাতিয়া ডাক বাংলোয় ক্যাম্প স্থাপন করে শুরু হয় প্রশাসনিক কার্যক্রম। সে এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা। একদিকে ৭০-এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসস্তূপ, সেই সাথে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আমাদের কমান্ড এলাকায় বিরূপ অর্থনীতি ও করুণ সামাজিক অবস্থা বিরাজ করছিলো।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চরম দারিদ্র্যপীড়িত দুই লক্ষাধিক জনবসতির সার্বিক দেখভাল করা আমার জীবনের অন্যতম সেরা ঘটনা। নভেম্বরের ১ম সপ্তাহে আমাদের ইউনিটের ডাক পড়ে রামগতি থানা আক্রমণের। ৪০ জন চৌকশ গেরিলা যোদ্ধা নিয়ে সমুদ্র পথে রামগতি পৌঁছালাম। গভীর রাতে পাক-নৌবাহিনীর গানবোটের পাশ কাটিয়ে রামগতি ক্যাম্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর সফল আক্রমণ করি। শতাধিক রাজাকার ও মিলিশিয়া আমাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে নদীর পাড়ে একটি সাইক্লোন শেল্টারে আশ্রয় নেয়। মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত আঘাতে দখলদার বাহিনীর শতাধিক পাকসেনা আহত ও নিহত হয়।

রামগতিতে মুক্তিবাহিনীর সফল অ্যামবুশের কারণে আজমল খান নামে এক পাকসেনা ধরা পড়ে আমাদের ইউনিটের কাছে।

উপর্যুপরি গুলির আঘাতে এই পাকসেনার একটি পা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। আজমল খান তার জীবনের শেষ আকুতি হিসেবে মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে থাকা তার স্ত্রীর নিকট নিজ হাতে পত্র লিখে। "ইয়ে মেরি আখেরি খত হায়" অর্থাৎ এটাই আমার জীবনের শেষ চিঠি, 'মুক্তিবাহিনী আমাকে পাকড়াও করেছে, কতল করবে আজকেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। দয়া করে আমার ছোট ভাইকে বিয়ে করে আমাদের পরিবারের সাথে বাকি জীবন কাটাবে'। ১৬ ডিসেম্বর যৌথবাহিনীর কাছে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর আজমল খানকে ভারতীয় বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। আজমলের ভাগ্যে পরবর্তীকালে কি ঘটেছিলো তা এখনো অজানা।

স্মৃতিকথন-৭৬

সংস্থার নাম: দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: চানন্দি, হাতিয়া, নোয়াখালী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সাখাওয়াত হোসেন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে মহান মুক্তিযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৎকালীন হাতিয়া শহরে বসবাসরত প্রায় ৪০ জন ছাত্র-যুবক স্থানীয় গার্লস স্কুলের প্রাচীরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। স্থানীয় আনসার ক্যাম্প হতে আমরা ২৪টি ডেমো রাইফেল নিয়ে প্রশিক্ষণ চালাই। ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকসেনারা ঢাকা শহরে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে গণহত্যা চালায় এবং অগ্নিসংযোগের পর ছাত্রলীগের স্থানীয় কর্মীদের নির্দেশে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রথমে আমরা ১১ জন হাতিয়া হতে ত্রিপুরা রওনা হই। ১১ এপ্রিল কুমিল্লার গুণবতি রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে আমরা ভারতের ত্রিপুরায় প্রবেশ করি। তখন পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু না হওয়ায় আমারা শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করি। শরণার্থী শিবিরে খাবার এবং পানির সংকট থাকায় ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক (গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড) পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে খাবার এবং পানি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতাম। ত্রিপুরার পালাটনা ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন সুজা আলীর অধীনে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। উচ্চতর গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের উত্তর প্রদেশে দেরাদুন জেলার মিলিটারি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিতে যাই। সেখানে প্রশিক্ষণ শেষে আমরা হাতিয়া ফিরে আসি।

তৎকালীন হাতিয়া থানা কমান্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম। তিনি ইতোমধ্যে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আরো ২৫ জন তরুণ প্রশিক্ষিত সেনা রফিক ভাইয়ের কমান্ডো ইউনিটে যোগদান করেন। এর মধ্যে হাতিয়া থানায় রাজাকার ও মিলিশিয়াদের কার্যক্রম জোরদার হওয়ায় ২৯ অক্টোবর দিবাগত রাতে আমরা হাতিয়া থানা আক্রমণ করে পাকবাহিনী এবং তাদের দোসরদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করতে সমর্থ হই। আমাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা কমান্ডারের নির্দেশে হাতিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ৯০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ

দেয়া হয় এবং আমি সেখানে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করি।

হাতিয়া ও রামগতির মুক্তিযোদ্ধারা যৌথভাবে ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ দিবাগত রাতে রামগতির পাকিস্তানি ক্যাম্পে আক্রমণ করে। অনেক পাকসেনা ও রাজাকার নিহত হওয়ার পর বাকিরা ১০ ডিসেম্বর নৌপথে গানবোট যোগে চট্টগ্রাম পালিয়ে যায়। লিয়াকত হোসেন নামে আহত এক পাকিস্তানি আর্মি আমাদের ইউনিটের হাতে ধরা পড়ে। পরে তাকে পাক-ভারত বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় ভারতীয় সৈন্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যুদ্ধের পরে আমরা হাতিয়া হতে স্টিমার যোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথিমধ্যে রামগতি হতে আরও প্রায় দুই শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সফরসঙ্গী হয়। থানা কমান্ডার রফিক ভাই প্রায় ৩০০ মুক্তিযোদ্ধার খাওয়ানোর দায়িত্ব পালন করেন। ৩১ জানুয়ারী ১৯৭২ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা আমাদের কাছে থাকা সমস্ত অস্ত্র ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর পায়ের নিকট জমা দেই। সেই সময় খুব কাছ থেকে এই মহানায়ককে দেখা ছিলো আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গবন্ধু আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন "দেশ স্বাধীন করেছো, এখন দেশের উন্নয়নে জন্য গ্রামে গিয়ে কাজ করতে হবে"। আমি এখনো মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সন্তানদের কল্যাণে সর্বদা সচেষ্ট আছি।

স্মৃতিকথন-৭৭

সংস্থার নাম: সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: চরএলাহী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অলি উল্যাহ

১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল দিনাজপুরের গদাগাড়ি ক্যাম্পে পাকবাহিনীর সাথে দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা লড়াই হয়। দীর্ঘ লড়াই করে আমরা পাকবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করি। পাকবাহিনীর অনেক সদস্য এই যুদ্ধে মারা যায়। লড়াইয়ে পাকবাহিনীকে আমরা পরাজিত করি। আমাদের সহযোদ্ধা জয়নাল এবং শফিক, তারা দুই ভাই ছিলো। তাদের মধ্যে শফিক পাকবাহিনীর বুলেটের আঘাতে আমার চোখের সামনে মারা যায়। শফিকের মৃত্যু আমাকে এখনো

নাড়া দেয়। এ রকম আরো বহু ত্যাগ স্বীকারের পর আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা।

স্মৃতিকথন-৭৮

সংস্থার নাম: উন্নয়ন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: জলমা, বাটিয়াঘাটা, খুলনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা নিরঞ্জন কুমার রায়

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য খুলনা শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসি। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে আমরা এলাকার কলেজ পড়ুয়া ছাত্ররা মিলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ইপিআর সদস্যদের জন্য শুকনা খাবার, ডাব ও চিড়া সংগ্রহ করি। এসময় কয়েকজন ইপিআর সদস্য খান সেনাদের সাথে যুদ্ধ করে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জলমা চক্রাখালী হাইস্কুলে আশ্রয় নেয়। স্থানীয় ডাক্তার বাবু সুবোধ চন্দ্র অধিকারী আহতদের ক্ষতস্থান থেকে গুলি বের করে দেন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। আমি সেসময় তাদের চিকিৎসা সেবায় সরাসরি অংশগ্রহণ করি। এর কিছুদিন পর এই সব খবর খান সেনাদের কাছে পৌঁছালে ২৪ এপ্রিল শনিবার বেলা একটার দিকে তারা দুইটি গান বোট নিয়ে কাজিবাঁচা নদী থেকে স্কুল ভবনের ওপর একটানা মর্টারের গুলি বর্ষণ করে। পরে ৩০/৪০ জনের মত খান সেনার একটি দল আমাদের গ্রামের মধ্যে ঢুকে সমস্ত বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেয় ও গুলি করে। সেদিন তিন জন সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সেদিন আমাদের গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের এক বাগানে অবস্থান নেওয়া ৪০/৫০ জন গ্রামবাসীকে পাশের গ্রামে চলে যেতে বলি। সবাই যথাসময়ে পাশের গ্রামে নিরাপদে আশ্রয় নিলে আমি খান সেনাদের ওপর গ্রেনেড চার্জ করে পালিয়ে যাই। আমি সেদিন খান সেনাদের গুলিতে জীবন দিলেও দুঃখ ছিলো না, কারণ আমি আমার গ্রামের অনেক মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে ১৯ মে বাদামতলা গণহত্যা, ২০ মে চুকনগর গণহত্যা ও ২১ মে ঝাউডাঙ্গা গণহত্যা প্রত্যক্ষ করতে করতে ভারতের আমডাঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ও আমার বড় ভাই এক সাথে প্রথমে

ভারতের ট্যাট্রা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নাম লেখাই। পরে ভারতের পীপা ক্যাম্পে অনেকের সাথে আমরা আর্মি মেডিকেল কোরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রী নিয়ে ভারতের বেগুনদিয়া ক্যাম্পে অবস্থান করি। এখানে আমরা রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমরা আহত ও অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করি। পরবর্তীকালে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গল্লামারী বেতার কেন্দ্র দখল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। জীবন বাজি রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আমি ধন্য।

স্মৃতিকথন-৭৯

সংস্থার নামঃ প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ রানীহাটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফজলুর রহমান

দেশমাতৃকাকে রক্ষার তাগিদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধকালীন আমার রণাঙ্গন ছিলো ৭ নম্বর সেক্টরের বৃহত্তর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দিন এখনো জ্বলজ্বল করে আমার স্মৃতিতে। এর মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার খাসেরহাট এলাকায় পাকহানাদার বাহিনীর সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ। সেইদিন আমরা মাত্র ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা কায়দায় পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই। যুদ্ধে মাত্র ৬ জন হয়েও আমরা পাকবাহিনীর ৩২ জন সদস্যকে পরাজিত করতে সক্ষম হই। সেইদিনের যুদ্ধে আমাদের দুই জন সহযোদ্ধাও শহিদ হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন। একদিন তিনি পাকবাহিনীর অবস্থান জানতে রেকি করতে বের হন। বের হওয়ার সময় তিনি আমাদের নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন সাবধানে থাকি এবং তিনি না ফেরা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু তিনি সেই যে গেলেন আর ফিরে এলেন না! আজো তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। মহান সৃষ্টিকর্তা তাকে বেহেশত নসিব করুন।

স্মৃতিকথন-৮০

সংস্থার নাম: প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: নেজামপুর, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রমজান আলী

১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দোরশিয়া গ্রামের পূর্ব দিকে পাগলা নদী। এই নদীর পূর্ব দিকে অনেক গ্রাম রয়েছে। তার মধ্যে রামচন্দ্রপুর হাট, ঘোড়াপাখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ্রপুর, কালীনগর, দোরশিয়া, পার ঘোড়াপাখিয়া, চক বহলাবাড়ী, যুক্তরাধাকান্তপুর ইত্যাদি গ্রামের কিছু মোড়ল-মাতব্বর পিস কমিটি, রাজাকার, আল বদর এবং আল শামস-এ যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু পাগলা নদীর পশ্চিম পাশের লোকজন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। এর প্রতিশোধ নিতে পাকবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় ঐদিন আমাদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমরা আগেই খবর পেয়ে এলাকার সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রাধাকান্তপুরে ক্যাম্প খুঁড়ে অবস্থান নেই। আমরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে লুকিয়ে থাকি। পাকবাহিনী অগ্রসর হতে থাকলে আমারা চারদিক থেকে অতর্কিতে সর্বাত্মক হামলা চালাই। দীর্ঘ বিশ মিনিট প্রায় তুমুল যুদ্ধের ফলে পাকবাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ঘটনাস্থলে আমাদের গেরিলাবাহিনীর ছয় জন সদস্য শহিদ হন এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। এলাকাবাসী শহিদ ব্যক্তিদের কবর খুঁড়ে তাদেরকে দাফন করে। আমার সেই দিনের কথা আজও মনে পড়ে। ঘুমের মাঝে সেই রাতের কথা আজও চোখে ভেসে উঠে, চোখ দিয়ে পানি ঝরে। আমি মুক্তিযুদ্ধের ঐ ঘটনাটি কোন দিনও ভুলবো না। চির অম্লান হয়ে থাকবে আমার স্মৃতিপটে।

স্মৃতিকথন-৮১

সংস্থার নাম: সোপিরেট

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: লাহারকান্দি, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মহিউদ্দিন

১৪ আগস্ট ১৯৭১ আমরা জানতে পারি যে, পাক হানাদার বাহিনী আমাদের মুক্তিকামী জনতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালাবে। তাই আমরা তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা (মুক্তিযোদ্ধারা) ১৭ আগস্ট সংগঠিত হই এবং সকালবেলা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিরোধ শুরু করি। এরই ধারাবাহিকতায় রাত প্রায় ৮টার পর উভয় পক্ষের মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হয়। এতে প্রায় ৭-৮ জন পাকহানাদার বাহিনীর সদস্য মৃত্যুবরণ করে, আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা ভাই শাহাদাৎ বরণ করেন এবং ১৫-২০ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আমি একজন আহত মুক্তিযোদ্ধাকে কাঁধে বহন করে এনেও বাঁচাতে পারিনি। এই ঘটনাটি আমাকে মারাত্মকভাবে ব্যথিত করে। এই যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনী তাদের কিছু অস্ত্র ফেলে বাংকার ছেড়ে পলায়ন করে। পাক সেনাদের বাংকারের একটি ঘর থেকে যুদ্ধকালীন নির্যাতিত মেয়েদের অনেকগুলো কাপড়-চোপড় এবং স্যান্ডেল দেখতে পাই। এই যুদ্ধের মধ্যদিয়ে আমরা ফুলবাড়িয়া এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে বিজয় পতাকা উত্তোলন করি। বীরত্বপূর্ণ সেই যুদ্ধের স্মৃতি এখনো আমার হৃদয়ে শিহরণ জাগায়।

স্মৃতিকথন-৮২

সংস্থার নাম: সোপিরেট

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: নোয়াগাঁও, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মজিবুর রহমান

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দিনই ছিলো ঘটনাবহুল। ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে মনে পড়ে খুলনার রাজাপুরের যুদ্ধ। এটি মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকের ঘটনা। ঐ সময় আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই যে, স্থানীয়

রাজাকারদের সহায়তায় রাজাপুরে পাকবাহিনীর একটি অংশ অবস্থান করছে। তাদের শায়েস্তা করার জন্য আমরা গোপনে রাজাপুরে অবস্থান নেই। এরপর সময় বুঝে গভীর রাতে গ্রামবাসীর সহায়তায় পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ করি। রক্তক্ষয়ী সেই যুদ্ধে আমাদের ১৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। গেরিলা পদ্ধতিতে আমরা খালপাড় এবং বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে আক্রমণ করলে পাকবাহিনী হতচকিত হয়ে পড়ে। আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ শেষে আমরা ১০ জন পাকসেনা এবং দুইজন স্থানীয় রাজাকারের লাশ উদ্ধার করি। গ্রামবাসীর সহায়তায় আমরা সেই লাশগুলো দাফন করি। সেদিনের সেই স্মৃতি মনে পড়লে আজো গা শিউরে উঠে। মানবতার ইতিহাসে এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট ঘটনা আর কোন জাতির বিরুদ্ধে যেন না হয়।

স্মৃতিকথন-৮৩

সংস্থার নামঃ পল্লীশ্রী

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ ২নং ফরক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইসরাইল আলী

১৯৭১ সালে ১ মার্চের পূর্বে আমি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করেন। তখন মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের আপামর জনসাধারণ দল-মত নির্বিশেষে এক হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সব আন্দোলনে আমি প্রতিনিয়ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। ১৯৭১ সালে ২৭ মার্চ দিনাজপুর জেলার কুটিবাড়ী ক্যান্টনমেন্ট থেকে ইপিআর সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইপিআর সেনারা পাকসেনাদের পরাজিত করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সমস্ত গোলাবারুদ বের করে নেয়। ঐসব গোলাবারুদ পুনর্ভবা নদীর অপরপ্রান্ত থেকে আনার জন্য ইপিআর সেনারা আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করেন। তখন আমি তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্গে যোগদান করি। ইপিআর সেনারা

গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করে কুটিবাড়ি ক্যান্টনমেন্ট থকে পাকসেনাদের হটিয়ে দিতে সমর্থ হয় এবং পাকবাহিনী দিনাজপুর ছেড়ে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে পালিয়ে যায়। আমরা দিনাজপুর শহরকে ২৭ মার্চ হতে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের দখলে রাখতে সক্ষম হই। কিন্তু ১৪ এপ্রিল পাকসেনারা সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট হতে পুনরায় ট্যাংক ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে আবারও দিনাজপুর আক্রমণ করে। আমি ভারতে পালিয়ে যাই এবং ডালিমগাঁ ইয়ুথ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেই ও মুজিববাহিনীতে যোগ দেই। প্রশিক্ষণ শেষ করে বাংলাদেশে অপারেশন করার জন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং দিনাজপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় সফলভাবে অনেক অপারেশন সম্পন্ন করি। কিন্তু স্থানীয় রাজাকারদের কারণে আমি পাকসেনাদের কাছে ধরা পড়ি। এরপর দীর্ঘ চার-পাঁচ মাস পাকসেনারা জেলখানায় আমার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করি। কিন্তু তারা আমাকে হত্যা না করে আমার ওপর আরো বেশি নির্যাতন চালায়। পরিশেষে ১৯৭১ সালে আল্লাহর রহমতে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আমি মুক্ত হই। তবে পাকসেনাদের নির্যাতনে আমার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়। তাই পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার কলকাতার বিধান চন্দ্র হাসপাতালে এক মাস চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আমাকে সুস্থ করে তোলে। সুস্থ হয়ে আমি পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে আসি। বর্তমানে আমি সুস্থ ও ভালো আছি।

স্মৃতিকথন-৮৪

সংস্থার নামঃ পল্লীশ্রী

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ ১২নং রাজারামপুর, বিরল, দিনাজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা অক্ষয় কুমার রায়

১৯৭১ সালে বাঙালি জনগণের ওপর নির্মম অত্যাচার দেখে আমি সিদ্ধান্ত নেই মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো। সে মোতাবেক আমি ভারত গমন করি এবং মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসি। মুক্তিযুদ্ধকালীন অনেক অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। এর মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হলো-দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার ৮নং শংকরপুর ইউনিয়নের ত্রিশুলা নামক স্থানের যুদ্ধ। উক্ত স্থানে পাকসেনাবাহিনীর একটি অংশ ক্যাম্প স্থাপন করে অবস্থান করছিলো। এমন সময় আমাদের মুক্তিবাহিনীর ওপর নির্দেশ আসে যে পাকিস্তানি ক্যাম্পে আমাদের আক্রমণ চালাতে হবে এবং ক্যাম্পটি দখল করতে হবে। মুক্তিবাহিনীর হাই কমান্ডের নির্দেশে আমরা গেরিলা পদ্ধতিতে আকস্মিক আক্রমণ চালাই। অপারেশনে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি মিত্রবাহিনীর একটি অংশও অংশগ্রহণ করে। আমাদের যৌথ আক্রমণে পাকবাহিনী হতচকিত হয়ে পড়ে। রক্তক্ষয়ী সেই সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রায় ৭২ ঘণ্টাব্যাপী চলে। এ যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনী মর্টার শেলসহ ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর দুঃসাহসিক আক্রমণে পাকবাহিনীর মনোবল একসময় ভেঙে পড়ে। আমরা রাতের বেলায় পাকবাহিনীর ক্যাম্প চারপাশ থেকে ঘেরাও করে ফেলি। মরণঘাতী সেই যুদ্ধে পাকবাহিনীর অনেক সদস্য মারা যায় এবং অন্য সেনারা পালিয়ে যায়। আমাদের কয়েকজন সহযোদ্ধা এবং মিত্রাবাহিনীর সেনারা ঐ দিন শহিদ হন। এছাড়া সেই সময় আমরা ৩ জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারকে আটক করি। পরবর্তী সময়ে আমরা তাদের বন্দি করে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেই।

স্মৃতিকথন-৮৬

সংস্থার নামঃ কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ আমবাড়িয়া, খোকসা, কুষ্টিয়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু হানিফ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমার বয়স ছিলো ২৭ বছর। পাকবাহিনীর নির্মমতা এবং দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থেকে ছুটে যাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। প্রথমে আমি যাই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরে প্রশিক্ষণের জন্যে। সেখানে থেকে প্রশিক্ষণ শেষ করে ফিরে আসি নিজ গ্রামে এবং স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার খলিলুর রহমানের সাথে বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এসব যুদ্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

স্থানগুলো হল কুমারখালী অপারেশন, শিলাইদহ অপারেশন এবং মহেন্দ্রপুর অপারেশন। এসব অপারেশনের মধ্যে কুমারখালী উপজেলার মহেন্দ্রপুর গ্রামে যুদ্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। এ যুদ্ধে আশেপাশের এলাকার সকল মুক্তিযোদ্ধা সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। ঐ যুদ্ধে আমরা সকলে সারা দিনভর পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করতে থাকি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধে দুইজন পাকহানাদার মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে নিহত হয় এবং আমাদের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীর গুলিতে শহিদ হন। তারা ছিলেন এলাকার হারেজ, কাদের ও কাশেম। যুদ্ধ শেষে আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে আসি।

স্মৃতিকথন-৮৬

সংস্থার নাম: মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ঘোড়জান, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রুহুল আমিন

মুক্তিযুদ্ধকালীন বৃহত্তর টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার নলসোন্দা ঘাট এবং মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলায় পরিচালিত বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। আমাদের মুক্তিক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন মোঃ মাইন। আমাদের বাহিনীর মোট সদস্য ছিলো ৪৫ জন। পাকবাহিনীর সাথে আমাদের বড় সম্মুখ যুদ্ধটি হয় টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার নলসোন্দা ঘাট এলাকায়। আমাদের কমান্ডার মোঃ মাইন-এর নির্দেশে আমরা দুটি গ্রুপে ভাগ হই। আমি যে গ্রুপে ছিলাম সেই গ্রুপ ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিমপাড়ে অবস্থান নেয়। অন্য একটি গ্রুপ ধলেশ্বরী নদীর উত্তরপাড়ে অবস্থান নেয়। কমান্ডারের নির্দেশে আমরা একসাথে আকস্মিকভাবে সেখানে অবস্থানরত পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে পাকবাহিনী দিশেহারা হয়ে এক সময় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এই যুদ্ধ চলে। পাকবাহিনীর বেশ কয়েকজন মারা যায়। আমাদেরও এক সহযোদ্ধা মোঃ বাহাজ উদ্দিন পাকবাহিনীর গুলিতে শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

স্মৃতিকথন-৮৭

সংস্থার নাম: সমাধান

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: পাঁজিয়া, কেশবপুর, যশোর

বীর মুক্তিযোদ্ধা শিবুপদ কর্মকার

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং এদেশীয় মদদদাতা আলবদর রাজাকার বাহিনী যৌথভাবে সাতক্ষীরা জেলার পাটকেলঘাটা বাজারে সাধারণ জনগণের ওপর গোলাবর্ষণ করে ঠিক সেই সময় খুলনা বিএল কলেজের ছাত্রনেতা ইউনুচ আলী (ইনু) এবং তালা থানার অন্তর্গত কানাইদিয়া গ্রামের মোঃ আব্দুস সালাম মোড়ল যৌথভাবে মাগুরা গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা দল গঠনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। বিভিন্ন গ্রাম থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধ করতে আগ্রহী তাদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। ৮নং ইউনিয়ন কমান্ডার জনাব সামছুর রহমানের নেতৃত্বে আমিসহ হাবিবুর রহমান, অবেদ আলী, কেষ্ট পাটনী, সাধন, আশুতোষ, সামাদ, সুশীল, বক্কার, আজিজ, আঃ মান্নান ও আঃ হামিদ-কে নিয়ে দল গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের ভাদ্র মাসে তালা থানার মাগুরা ক্ষত্রিয় পাড়ায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ চলাকালীন আমার সহযোদ্ধা সুশীল, বক্কার ও আজিজ শহিদ হন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিপুল সেনাসদস্য এবং ভারী অস্ত্রের সামনে দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তাই পিছু হটতে হয়েছিলো আমাদের। দেশ যখন স্বাধীনতার কাছাকাছি সময়ে, তখন কপিলমুনি বাজারের রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাগণ মাগুরা গ্রামকে নিরাপদ মনে করে এবং মাগুরা গ্রামের অজয় রায় চৌধুরীর বাড়ির দোতলায় বসে কপিলমুনি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের নকশা তৈরি করি। প্রায় ৮০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ১৮টি দলে ভাগ হয়ে তালা ও কপিলমুনির মধ্যকার ব্রিজটি ভেঙে ফেলে টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিই। এরপর রাজাকার ক্যাম্পে ১৮টি দল একসঙ্গে আক্রমণ করি। আক্রমণের সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা

শহিদ হন। তীব্র আক্রমণে দিশেহারা হয়ে রাজাকার বাহিনীর ১৫১ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকারী রাজাকারদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সহচরী বিদ্যামন্দিরের মাঠে। গণআদালতের মাধ্যমে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। একজন সম্মুখ সারির মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেকে গর্বিত মনে করি এবং আমার সহযোদ্ধা যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

স্মৃতিকথন-৮৮

সংস্থার নাম: সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস-সাভার)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: আয়ুবপুর, শিবপুর, নরসিংদী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মফিজ উদ্দিন মোল্লা

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। আমি সরাসরি ঐ ভাষণ শুনি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতে যাই। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষ করে বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। আমার যুদ্ধ এলাকা ছিলো বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল। সিলেটের শাবাজপুর এলাকায় আমরা পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করি। যুদ্ধে আমাদের সহযোদ্ধা মোঃ মজিবুর রহমান শহিদ হন। তাঁর মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে মর্মাহত করে। সেদিন পাকবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য এবং তাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র থাকায় আমরা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি। সেই যুদ্ধে আমি আমার বাম পায়ের হাঁটুতে বড় ধরনের আঘাত পাই। এখনও সেই আঘাতের চিহ্ন নিয়ে বেঁচে আছি। আল্লাহর অশেষ রহমতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহীদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। সবশেষে বলতে চাই স্বাধীন বাংলাদেশের মহান মুক্তি সংগ্রামের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে আমি গর্ববোধ করি।

স্মৃতিকথন-৮৯

সংস্থার নাম: সিডার (কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম কবির

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকবাহিনী নির্মমভাবে গণহত্যা শুরু করলে সর্বত্র থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিলো। এর কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের এলাকায় পাকবাহিনী প্রবেশ করে গণহত্যা শুরু করে। এলাকার মানুষ ভয়ে অন্যত্র চলে যায় এবং অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়। এলাকার বেশ কিছু যুবক পাকবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। প্রথম দিকে তাদের পরিবারের কেউ রাজি ছিলো না। এজন্য আমরা তাদের পরিবারের সাথে কথা বলি। পরে পরিস্থিতি বিবেচনা করে মা-বাবাসহ সকলে অনুমতি দেয়। আমরা নৌকা ও পায়ে হেঁটে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে প্রবেশ করি। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা ১০ জনের একটি দল গভীর রাতে আশুগঞ্জ নামক স্থান দিয়ে পুনরায় দেশে প্রবেশ করি। অন্ধকার রাত, চারদিক জঙ্গলে ঘেরা। কোথাও কোথাও পাকবাহিনীর দেওয়া আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছিলো। আমরা রেললাইনের পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকি। চারগাছ নামক জায়গায় পাকবাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি বুঝতে পারি। কিন্তু কিছু বুঝে উঠার আগেই পাকবাহিনী এলোপাথাড়ি গোলাগুলি শুরু করে। আমরা নিরুপায় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ি। পাকবাহিনীকে মোকাবিলা করবো এমন অস্ত্র আমাদের কাছে ছিলো না। হঠাৎ একটি গুলি আমার ডান কানের পাশ দিয়ে চলে যায়। ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বেশ কিছু সময় শুয়ে থাকি। তখন মনে হচ্ছিলো, আর বুঝি দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করা হলো না। শত্রুর হাত থেকে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার ইচ্ছা আর পূরণ হবে না ভেবে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু আল্লাহর অশেষ কৃপায় গুলিবর্ষণ শেষ করে কিছুক্ষণ পর পাকবাহিনী অন্যত্র চলে যায়। ধীরে ধীরে ভোর হলে আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকি এবং পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেই। সন্ধ্যার পর আমরা ০২নং সেক্টরের মেজর হায়দারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি। অতঃপর নয়

মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে লাল-সবুজের পতাকা হাতে নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসি।

স্মৃতিকথন-৯০

সংস্থার নাম: পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মোনাখালী, মুজিবনগর, মেহেরপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমজাদ হোসেন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে আমরা কখনো গেরিলা কায়দায় আবার কখনো সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এর মধ্যে একটি সম্মুখ যুদ্ধের ঘটনা স্মরণ করতে চাই। আমাদের কামান্ডার ছিলেন মোঃ আঃ গাফ্ফার কুতুবী। একদিন আমারা জানতে পারি যে, পাকবাহিনীর একটি দল কুতুবপুর এলাকায় নদীর পূর্ব দিকে অবস্থান নিয়েছে। এ খবর শুনে আমরা নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থান নিই। আমাদের উপস্থিতি বুঝতে পেরে পাকবাহিনী হঠাৎ সকাল ৭টার সময় বলতে থাকে "কিধার হ্যায় মুক্তিযুদ্ধা সামনে আ যাও, মালাউন কা বাচ্চা" বলে আমাদের দিকে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ শুরু করে। এর পাল্টা জবাবে আমরাও 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করি। আমাদের তুমুল আক্রমণে পাকবাহিনী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আমাদের কৌশলগত যুদ্ধের ফলে পাকবাহিনীর ৮ জন সদস্য নিহত এবং ২০ জন আহত হয়। সৌভাগ্যবশত আমাদের পক্ষের কেউ আহত হয়নি। তবে পাকবাহিনীর সেলের আঘাতে আমাদের দুইজন আহত হয়। আমাদের কাছে সেই দিনটা ছিলো ঈদের দিনের মতো। আমাদের কঠোর মনোবল ও যুদ্ধের কৌশলগত কারণে পাকবাহিনী কুতুবপুর ছেড়ে পিছু হটে এবং মেহেরপুর চলে যেতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক মুক্তিকামী জনতার।

স্মৃতিকথন-৯১

সংস্থার নাম: পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন, গাংনী, মেহেরপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু বক্কর

১৯৭১ সাল, প্রতিটি ক্ষণ বিভীষিকাময়। জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিয়তায় ভরা। চারিদিকে হাহাকার। পাকহানাদার বাহিনী আমাদের ওপর যে বর্বরতা চালিয়েছে, তা আমার মনকে বিষিয়ে তুলেছিলো। আমি সিদ্ধান্ত নিই এই অত্যাচারী শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে সেই লড়াইয়ে আমিও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবো এবং হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্ত করবো। এ লক্ষ্যে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নাম দিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে চলে গেলাম ভারতের শিকারপুর, জমসেদপুর, করিমপুর, কড়ুইগাছি ও রামপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে। প্রশিক্ষণ শেষে নিজ দেশে ফিরে ঝাঁপিয়ে পড়ি হানাদার বাহিনীর ওপর। বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করি এবং সহড়াতলা–কাজিপুর গ্রামের মাঝামাঝি দাদুয়ার মাঠে পাকহানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করি। যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থায় আমার সহযোদ্ধারা অনেকেই আহত হয়। এক পর্যায়ে হানাদার বাহিনীর কামানের গুলি এসে লাগে আমার বাহুতে। ফলে আমি মারাত্মকভাবে আহত হই। কিন্তু এতেও আমি আমার মনোবল হারায়নি। আহত থেকেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকি। যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত হয়। অনেকেই আহত হয় ও অন্যরা পালিয়ে যায়। আমার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরবর্তীকালে আমাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুনতে পাই পাকবাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমিও এর কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে উঠি।

স্মৃতিকথন-৯২

সংস্থার নাম: সেতু

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: গোলাবাড়ি, মধুপুর, টাঙ্গাইল

বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ মোতালেব হোসেন

পাকবাহিনীর নির্মম গণহত্যা এবং নির্যাতনের ভয়াবহতা আমার মনকে বিষিয়ে তোলে। তাই সিদ্ধান্ত নিই মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো। এজন্য আমি প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে যাই। প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশে ফিরে আসি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের সংঘটিত বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। এর মধ্যে গাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় সংঘটিত হয় পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ। সেদিন আমরা মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা গাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব দিক থেকে অগ্রসরমান পাকিস্তানি বাহিনীকে থামিয়ে দেই। সকাল ১০টায় এই যুদ্ধ শুরু হয়ে সারাদিন চলে। যুদ্ধে অনেক পাকসেনা নিহত হয়। আমাদের সর্বাত্মক আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকবাহিনী তাদের ক্যান্টনমেন্টের সাথে যোগাযোগ করে এবং সাহায্য চায়। পরের দিন পাকবাহিনীর বিমান সেনারা বোমা হামলা শুরু করে। তাদের আক্রমণে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই। ঐ দিন আমরা আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে হারাই। ঐ যুদ্ধ ছাড়াও আমি ময়মনসিংহের রাস্তায় সাইনবোর্ড নামক জায়গায় এবং পরে সিড়স্টোর এলাকায় যুদ্ধ করি। এছাড়া, এ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজগুলো ভেঙে ফেলি। এর ফলে পাকবাহিনীর সদস্যদের যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বাধার সম্মুখীন হয়। যুদ্ধকালীন আমি অনেক বেসামরিক লোকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দিই, যারা পরবর্তীকালে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্মৃতিকথন-৯৩

সংস্থার নাম: শাপলা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কামারগাঁ, তানোর, রাজশাহী

বীর মুক্তিযোদ্ধা সরদার ময়েজ উদ্দীন আহম্মেদ

মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর সদস্য ছিলাম। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা সদস্য হিসেবে আমার কাজ ছিলো পাকবাহিনীর উপস্থিতি ও কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহ করা। রাজাকার, আলবদর ও পিস কমিটির তান্ডব দেখার জন্য ডাক্তার আঃ খালেকের পরামর্শে আমি ছদ্মবেশে কখনো ফেরিওয়ালা বা কখনো কৃষকের বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম। ১৫ জুন ১৯৭১ চৌবাড়িয়া স্কুলের পিয়ন নাসির উদ্দিনের সাথে দেখা করে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ অন্যদের আমার বিসমিল্লাহ হোমিও ফার্মেসির ঘরের ছাদে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। পাকবাহিনীর তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি কালিকাপুর, মহাদেবপুর, জোতবাজার ও দেলুয়াবাড়ি মান্দা, তানোর থানার বিভিন্ন স্থানে যাই। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকবাহিনীর নৃশংসতা আমাকে মারাত্মকভাবে মর্মাহত করে। এসময় কামারগাঁ ইউনিয়নের কৃষ্ণপুরের ছবের খলিফার বড় ছেলে মফিজ উদ্দিন রাজাকার, প্রধান পিয়ার, ইউনুসসহ অন্যান্যরা গ্রামে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। কামারগাঁর দক্ষিণে বধ্যভূমিতে অসংখ্য যুবক ছেলেকে মাটির নিচে পুঁতে রাখে। তৎকালীন চেয়ারম্যান মেম্বারের লোকেরাই রাজাকার, আলবদর বাহিনী গঠন করে। ৯ আগস্ট ১৯৭১ মালশিরা গ্রামের উত্তর ধার দিয়ে ৫০টি বাড়ি, চৌবাড়িয়া হাটচালা ও হোসেনপুর, মসিদপুর ও আইওর পাড়া গ্রামের ১৫/১৬টি বাড়িসহ মোট ৩৬০টি বাড়ি রাজাকার পাকবাহিনী গান পাউডার দিয়ে ফায়ার করে পুড়িয়ে দেয়। পাকবাহিনী ২৮ আগস্ট ১৯৭১ পাকুড়িয়া গ্রামের ১২৮ জন পুরুষকে ভোরে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে পাকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সারি করে ব্রাশফায়ার ও গুলি করে মেরে ফেলে।

স্মৃতিকথন-৯৪

সংস্থার নাম: শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: এলাঙ্গী, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হালিম

সময়টা ছিলো ১৯৭১ সালের মে মাস। এলাকার দুই-একজন মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে শুনেছি। আমার বয়স তখন ২০ বছরের কাছাকাছি, গ্রামের আর দশজন তরুণের মতো আমিও স্বাভাবিক জীবন যাপন করি, দূরের

পাড়ায় যেয়ে রেডিওতে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ শুনি এবং ধীরে ধীরে যুদ্ধে যাবার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এমন সময় গ্রামের একদল কুচক্রী মহল আমার গ্রামসহ আশপাশের গ্রামের তরুণ ও যুবকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আলবদর বাহিনীতে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১২ মে সন্ধ্যায় বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে আমিসহ মোট তিনজন বাড়ি থেকে পালিয়ে যেয়ে গ্রামের পাশের মাঠে সারা রাত কাটাই। পরের দিন ভোরবেলা বাড়িতে ফিরে এসে কিছু কাপড় এবং মায়ের কাছে দোয়া নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলাম। মায়ের সেই অশ্রুসিক্ত দুচোখ আজও মনে পড়ে। বাড়ি থেকে বের হয়ে জগদীশপুর বাঁওড়ের গলা পর্যন্ত পানি পার হয়ে কাশিপুর মাঠের মাঝে সারাদিন না খেয়ে-দেয়ে কাটিয়ে দিই। কারণ কাশিপুরের পাশে কোটচাঁদপুরে পাকহানাদার বাহিনীর বেশি আনাগোনা ছিল। পরে রাতের বেলা এক বাড়ি থেকে কিছু হালকা খাবার খেয়ে পায়ে হেঁটে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে ঢুকে ভোমরা বন্দরের নিকট হাকিমপুর ক্যাম্পে পৌঁছাই এবং ১ মাস ১০ দিন প্রশিক্ষণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যুদ্ধের সময় সাতক্ষীরার কলারোয়া ও হিজলদী এলাকায় যুদ্ধ করি।

স্মৃতিকথন-৯৫

সংস্থার নাম: কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-কোডেক

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কুলকাঠি, নলছিটি, ঝালকাঠি

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের মোল্লা

১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে খুলনা দামুদর মাঠে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেই। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ হই এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করি। আমার কয়েকজন বন্ধুকেও যুদ্ধে যাবার জন্য পরামর্শ দিই ও বুঝিয়ে বলি। অতঃপর আমি আমার দুইজন বন্ধুকে নিয়ে ১৫ এপ্রিল বরিশাল বেলস্-পার্ক ময়দানে ০৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিলের টিমে যোগদান করি। আমি আগে থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থাকায় যোগদানের পরেই রণাঙ্গনের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে

পড়ি। আমাদের কাছে তেমন কোন অস্ত্র না থাকার কারণে প্রথমে রাজাকারের বেশে খাকি পোশাক পরিধান করে কাঠালিয়া থানায় প্রবেশ করি এবং বিভিন্ন কৌশলে সেখানকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলে আসি। এরপর থেকে একের পর এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকি। যুদ্ধকালীন আমি অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী ছিলাম। এর মধ্যে নলছিটি থানা পাকিস্তানি রাজাকারদের হাত থেকে মুক্ত করার ঘটনাটি আমার বেশি মনে পড়ে। পাকসেনা ও রাজাকারদের অন্যতম একটি ক্যাম্প ছিলো নলছিটি থানা ফাঁড়ি। পাকসেনাদের অত্যাচারের হাত থেকে নলছিটির সাধারণ মুক্তিকামী বাঙালিদের মুক্ত করার জন্য ১৭ জনের মুক্তিবাহিনীর একটি দল নিয়ে বিকাল ৩ টার দিকে থানা ফাঁড়ির পেছনে আক্রমণ করি। দীর্ঘ সময় বন্দুক যুদ্ধ চলতে থাকে। এই সময় পাকসেনাদের কিছু সংখ্যক সেনা নিহত হলেও পাকসেনারা সংখ্যায় বেশি থাকায় কোনোভাবেই আমরা সামনে এগুতে পারছিলাম না। এভাবে দীর্ঘ সময় যুদ্ধ চলার মধ্যে আমার পাশেই একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনাদের গুলিতে শহিদ হন এবং আরেকজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢলে পড়েন। তাঁর অবস্থা মারাত্মক দেখে আমরা তাঁকে নিয়ে যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে আসি। কিন্তু আসার পথেই আহত সহযোদ্ধা শহিদ হন। ঐ ঘটনার ১৭ দিন পর আমরা আমাদের মুক্তিবাহিনীর দলকে আরো শক্তিশালী করে পুনরায় নলছিটি থানা ফাঁড়িতে আক্রমণ করে পাকসেনাদের হাত থেকে নলছিটিবাসীকে মুক্ত করতে সক্ষম হই।

স্মৃতিকথন-৯৬

সংস্থার নামঃ পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী (পিএমকে)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ গোলাকান্দাইল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ মজিদ মোল্লা

১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিই। এজন্য সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যাই। ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং নারায়ণগঞ্জের বালিয়াপাড়া বাজারে অবস্থান করি। পরবর্তীকালে

আমি এ অঞ্চলের অন্যান্য মুক্তিসেনাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং সবাইকে নিয়ে গাউছিয়াতে অবস্থান করি। কারণ সে সময় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থায় গাউছিয়া ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট। পাকবাহিনীর সদস্যরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ পথ দিয়ে হরহামেশাই যাতায়াত করতো। পাকবাহিনী গাউছিয়া দিয়ে যাওয়ার সময় একদিন আমরা সুযোগ বুঝে সম্মিলিতভাবে আকস্মিক আক্রমণ করি। উভয় পক্ষের গোলাগুলিতে পাকবাহিনীর কয়েকজন সদস্য নিহত হয়। আমাদের প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে পাকবাহিনী বাধ্য হয়ে ডেমরার দিকে রওনা হয়। আমরাও অগ্রসর হয়ে খাদুন এ অবস্থান নিই। এই সময় মিত্রবাহিনীর কিছু সৈনিক আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়। তাদের সাথে আমরা যৌথভাবে ডেমরার দিকে অগ্রসর হই। আনুমানিক দুপুর ১২টার দিকে পাকবাহিনীর ওপর আমরা আবারো তীব্র আক্রমণ চালাই। তাদের ক্যাম্প ধ্বংস করে দিই। এরপর আমরা পুনরায় ঢাকার দিকে অগ্রসর হই। ঢাকা যাওয়ার সময় ডেমরার ব্রিজ ভেঙে দিই যার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ঢাকা-ডেমরার যাতায়াত ব্যবস্থা পাকবাহিনীর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়।

স্মৃতিকথন-৯৭

সংস্থার নামঃ ইপসা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ কলমপতি, কাউখালী, রাঙামাটি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোস্তফা

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম গণহত্যা দেখে আমি ক্ষুব্ধ হই। প্রতিজ্ঞা করি যেভাবেই হোক পাকবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিই যুদ্ধে যোগ দেবার। এজন্য আমি প্রথমে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত চলে যাই। ভারতের বগাপাহাড় এলাকায় ২১ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশে ফিরে আসি। আমরা আমাদের প্লাটুন কমান্ডার মোঃ আক্তার কামালের নেতৃ--ত্বে রামগড় বর্ডার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। এরপর রামগড় হতে

চট্টগ্রামের মিরসরাই যাই। মিরসরাই হতে পরবর্তীকালে আমরা সন্দ্বীপে যাই। কারণ সে সময়ে সন্দ্বীপ থানায় পাকবাহিনীর একটি শক্তিশালী ক্যাম্প ছিলো। আমাদের কাছে নির্দেশ আসে যে, যেভাবেই হোক সন্দ্বীপ থেকে পাকবাহিনীকে তাড়াতে হবে। সন্দ্বীপ পৌঁছে আমরা কোম্পানি কমান্ডার আবুল কাশেমের বাহিনীতে যোগ দেই। তার নির্দেশনায় সেকশন কমান্ডার রুহুল আমিন ও প্লাটুন কমান্ডার মোঃ আক্তার কামালের নেতৃত্বে ৩০০ জনের বেশি মুক্তিবাহিনীর সদস্য একত্রিত হয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্প ঘেরাও করি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে আমাদের তুমুল সংঘর্ষ চলে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাকবাহিনীর বহু সদস্য নিহত হয় এবং পাকবাহিনীর প্রায় ৩৩ জন সদস্য মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা চট্টগ্রামে আসি। চট্টগ্রামের শুভপুর ব্রিজ টার্গেট করে আমরা একত্রিত হই। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর আকস্মিক হামলা করে আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আহ্বানে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে (বর্তমান কাস্টমস অফিস) অস্ত্র জমা দিই।

স্মৃতিকথন-৯৮

সংস্থার নামঃ ইপসা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ পানছড়ি ইউনিয়ন, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলী আকবর

১৯৭১ সালে যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি টগবগে তরুণ। মা-বোনদের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো। এজন্য আমি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের আসাম রাজ্যে চলে যাই। আসাম রাজ্যের মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আমি ২৮ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে আমি বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং সিলেট জেলার তাইপুর থানা এলাকার বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন কর্নেল শওকত। সেক্টর কমান্ডার কর্নেল শওকতের নির্দেশে আমরা ৩৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠিত হই। পরবর্তীকালে

৩৩ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ১১টি গ্রুপ করে আমাদের ভাগ করা হয় গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য। পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অনেক পাকসেনাকে পরাজিত করেছি। আব্বাস, সুকুমার, গোলাপ মিয়া, কাজি উদ্দিনসহ আরও নাম না জানা অনেক সহযোদ্ধা সেই দিনগুলোতে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু যুদ্ধকালীন আমার সহমুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু আমাকে এখনো ব্যথিত করে। যুদ্ধে আমার চোখের সামনে সহযোদ্ধা জগৎজ্যোতি দাশকে শহিদ হতে দেখে খুবই মর্মাহত হয়েছি। সিলেট অঞ্চল ছাড়াও আমরা জামালপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। খেয়ে না খেয়ে দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।

স্মৃতিকথন-৯৯

সংস্থার নামঃ ইপসা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ সৈয়দপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু তাহের

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পূর্বে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তার ওপর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে আমার কোম্পানিকে ১নং সেক্টরের অধীনে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাঠানো হয়। সেসব জায়গায় আমরা খণ্ড খণ্ডভাবে অবস্থান করি। একদিন আমরা পাকিস্তানি ক্যাম্প ও এদেশীয় দোসর রাজাকারদের ওপর আক্রমণ চালাই। আমরা সেইদিন ঐ এলাকার ৫ জন রাজাকার ও ৭ জন পাকিস্তানি হানাদারকে আটক করি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাঁশখালী উপজেলাধীন কালিপুর ইউনিয়নে পাকহানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমাদের সাথে ভারতীয় মিত্রবাহিনী যৌথভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সম্মুখ যুদ্ধে এক ভারতীয় সেনা গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

স্মৃতিকথন-১০০

সংস্থার নাম: গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সারিয়াকান্দি সদর ইউনিয়ন, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জহুরুল ইসলাম

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে যমুনা নদী থেকে নৌকাযোগে দিনাজপুরের মানিকচর হয়ে বালুঘাট কামারপাড়া যুব ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের জন্য অবস্থান করি। সেখানে ২৯ দিন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করি। প্রশিক্ষণ থেকে ফেরার পথে দিনাজপুরের হিলি বর্ডারে অবস্থানের পর রাতে একটা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন করি এবং সকালে খাবারের খোঁজে বের হই। খাবারের সন্ধান পাওয়ার পর আমাদের দলের মোঃ আব্দুল কুদ্দুসকে খাবার আনতে পাঠালে খাবার নিয়ে আসার পথে পাকসেনারা তাকে দেখে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে সে ভয়ে খাবার ফেলে পাশেই এক বুড়ির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বুড়িমা তাকে নিজের শাড়ি পরিয়ে শুইয়ে রাখেন। পাকসেনারা বুড়িমার বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে আব্দুল কুদ্দুস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বুড়িমা কৌশলে তাকে তার নাতনি পরিচয় দেন এবং পাকসেনাদের হাত থেকে রক্ষা করেন। এরপর দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি আমাদের স্বাধীনতা। মাঝে মাঝে যখন চোখ বন্ধ একাত্তরের ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করি, তখনই বুড়িমার সেই আগলে রাখার স্মৃতি হৃদয়কে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়।

স্মৃতিকথন-১০১

সংস্থার নাম: গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: গাবতলী সদর ইউনিয়ন, গাবতলী, বগুড়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আশরাফ আলী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর যখন বুঝতে পারলাম দেশে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় নাই তখনই মুক্তিযুদ্ধে

অংশগ্রহণ করার মনস্থ করি। তখন আমার বয়স ছিলো ২১ বছর। দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার পর আমি যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় আমরা বেশ কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা টিম থানা ঘেরাও করলাম। এ সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং রাজাকারদের সাথে আমাদের গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলো। গোলাগুলির এক পর্যায়ে আমার সামনে একটু উঁচুতে এক মুক্তিযোদ্ধা জোরে চিৎকার করে উঠল। পরক্ষণে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি রক্তমাখা শরীর নিয়ে উঁচু থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। একজন সহযোদ্ধাকে নিজের চোখের সামনে এভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখে সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

স্মৃতিকথন-১০২

সংস্থার নাম: কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সন্তোষপুর, চিতলমারী, বাগেরহাট

বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ মালেক মল্লিক

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো-এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম" এ কথা অন্তরে গেঁথে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন নিজের বুকে লালিত করে আসছিলাম। ১৯৭১ সালের বাংলা বছরের আষাঢ়ের ৭ তারিখ রবিবার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে আমাদের উপজেলার চরবানীয়া ও সন্তোষপুর ইউনিয়নে। খাল বেয়ে গানবোট নিয়ে পাকবাহিনী হামলা করে। খালের দু-পারে নেমে পুড়িয়ে দেয় আশেপাশের সকল বাড়ি-ঘর। গোলাগুলি আর আর্তচিৎকারের আওয়াজ চারপাশে পাচ্ছিলাম। আমি আমার এলাকার কিছু লোক নিয়ে এলাকার হিন্দু-মুসলিম যাকে পেয়েছি তাকে নিয়ে যতটা সম্ভব নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করি। সন্ধ্যার পর আমরা ভয়ে ভয়ে বের হই। গ্রাম আর গ্রাম ছিলো না, চারদিকে লাশ আর ঘর-বাড়ির ধ্বংসস্তূপ পড়েছিলো। এ সব হত্যাযজ্ঞ দেখে আর নিজেকে সেদিন আর ধরে রাখতে পারিনি। শত প্রতিবন্ধকতার পরেও যুদ্ধ করবো, দেশকে স্বাধীন

করবো এ উদ্দেশ্যে চলে গেলাম ভারতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে। ফিরে এসে ৯নং সেক্টরে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানায় যুদ্ধে যোগ দিলাম। বলে বোঝানো যাবে না সে সময়কার পরিবেশের কথা। যুদ্ধকালীন একদিন সম্ভবত ভাদ্রের ৫ তারিখ আমরা পড়লাম পাকিস্তান বাহিনীর অ্যামবুশের মধ্যে। গোলাগুলি শুরু হয়। এসময় আশ্রয় নেই একটি ব্রিজের নিচে। পাল্টাপাল্টি গোলাগুলিতে হানাদাররা সুবিধা করতে না পেরে পিছু হটে। আমি ও আমার সাথীরা ওখান থেকে বের হয়ে সামনে এগুতে থাকি। চলতে চলতে ঢুকে পড়ি আখ ক্ষেতে। ভাগ্য সহায় ছিলো না। টের পেয়ে যায় শয়তানরা। গুলি করা শুরু করে চোখের সমানে। আমার কয়েকজন সহযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। আমার বন্ধু মোক্তার ছিলো খুব ভালো ছেলে। ওর শরীরে দুই দুইটা গুলি লাগে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত ফাল দিয়ে বের হচ্ছিলো। না পারছি ওকে ধরতে না পারছি কিছু করতে। যখন হানাদাররা পিছু হটে তখন রক্তাক্ত ভাইদের লাশ ডিঙিয়ে কাউকে টেনে ডোবায় ফেলে রাস্তার পাশে সরিয়ে চলে আসতে হয়। ৮-৯ জন শহিদ হন সেদিন। তাঁদের রক্তে লাল মাটির পথ ডিঙিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকি। সেই অনুভূতি বলে প্রকাশ করার নয়।

স্মৃতিকথন-১০৩

সংস্থার নামঃ এসোসিয়েশন ফর আন্ডার প্রিভিলেজড পিপল (আপ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বাগানবাড়ি, উত্তর মতলব, চাঁদপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মিঞা আঃ মতিন

১৯৭১ সালের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমার বয়স তখন ১৭ বছর। আমরা ৪ এপ্রিল পাঁচ জন পায়ে হেটে বক্সনগর ক্যাম্পে পৌঁছাই, ক্যাম্পে আমরা তিন দিন অবস্থান করি, তারপর আমাদের রিক্রুট করে ৫০ জনের ব্যাচ তৈরি করা হয়। আমাদের চিড়া, মুড়ি, গুড় দিয়ে ট্রাকে উঠানো হয়। আমরা তিন দিন পর আসাম-এর কাছার জিলার লোহারবন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পৌঁছাই। ভারতীয় সেনা সদস্যরা আমাদেরকে গ্রহণ করে। তারা আমাদেরকে খাবার

দেয়, আমরা ২১ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি, তারপর ১০ জনের আলাদা একটা গ্রুপ করে আরও ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ করানো হয়। আমরা ট্রাকে করে ৪নং সেক্টর জালালপুর চলে আসি, তৎকালীন নাতানপুর ইপিআর ক্যাম্পে একটি ক্যাম্প করা হয়। আমাকে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ক্যাম্প লিডার করা হয়। সিলেটের তিনটি থানায় আমাদেরকে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার মধ্যে সিলেটের আটগ্রাম থানা অপারেশন করতে তিনদিন সময় লাগে, অপারেশন শুরু হয় রাত ২টায় এবং শেষ করতে বাজে রাত ৪টা। আমরা প্রথম দিন কোমর সমান পানি দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্পের কাছে পৌঁছার পর আমাদের একজন সহযোদ্ধা জোঁকের কামড়ে টিকতে না পেরে একটু শব্দ করে। সাথে সাথে পাকিস্তানি সৈন্যরা টের পেয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে। আমাদের ১০ জন সহযোদ্ধা সেদিন শহিদ হন। আমরা চারজন সহযোদ্ধার লাশ ফেরত আনতে সক্ষম হই। আমার ডান পাশের জন এবং বাম পাশের জন শহিদ হন আর আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে বেঁচে যাই। ঐ দিন আমরা অপারেশনের মাধ্যমে পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে পরাজিত করতে পারি নাই। পরের দিন আমরা আবার গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে পরাজিত করি এবং তাদের চারজন সৈন্যকে জীবিত ধরে নিয়ে আসি। সেদিন এর অপারেশনে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। সিলেটের লোকদের সাথে ভাষাগত কিছু সমস্যার কারণে পরবর্তীকালে আমাদের মাঝে অনেক রাজাকার ঢুকে পড়ে, তারা আমাদের বিভিন্নভাবে সমস্যায় ফেলে। আমি অসুস্থ অবস্থায় শিলং বর্ডার পার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই এবং ২নং সেক্টরের মাধ্যমে আমার এলাকায় ফিরে আসি। পরবর্তীকালে গোয়ালমারিতে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

স্মৃতিকথন-১০৪

সংস্থার নামঃ বেডো

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বোয়ালিয়া, নওগাঁ সদর, নওগাঁ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আফজাল হোসেন

আমি সম্মুখসারির যোদ্ধা হিসেবে মিত্রবাহিনীর একজন সদস্য ছিলাম। আমাদের কোম্পানিতে আমরা ছিলাম বাংলাদেশী ১০৪ জন এবং এক

ব্যাটালিয়ান ভারতীয় সেনাবাহিনী (গোরখা রেজিমেন্ট)। আমরা এবং মিত্রবাহিনী যৌথভাবে প্রথম অপারেশন করি ত্রিশুল ও পশ্চিম দিনাজপুরে। সেখানে একজন ভারতীয় সেনা নিহত হয়। সেখান থেকে ফুলবাড়ী, গোলাপবাগ, পলাশবাড়ী, চরকাই রেলওয়ে স্টেশন হয়ে কাঠাখালি ব্রিজে অবস্থান নেই এবং সেখানে ৩/৪ দিন ধরে পাকবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সঙ্গে চূড়ান্ত গোলাগুলি হয়। অবশেষে ভারতীয় সৈন্যরা পাকবাহিনীর ওপর বিমান হামলা করে। সেখানে ৭০ জন পাকসেনা মিত্রবাহিনীর হাতে বন্দি হয়, একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনার গুলিতে আহত হয়। তারপর ঐখান থেকে আমরা বগুড়া সদরে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে ২ জানুয়ারি বিজয়ী বেশে বাড়ি চলে আসি।

স্মৃতিকথন-১০৫

সংস্থার নামঃ বেডো

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ ছাতিয়ানগ্রাম, আদমদীঘি, বগুড়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার মোঃ আব্দুস ছাত্তার

১৯৭০ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। আমি তখন ৮ম শ্রেণির ছাত্র। আমার বাবা (মরহুম সাহেব আলী খন্দকার) কৃষক ছিলেন। উৎপাদিত ফসল বিক্রি করেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা মেটাতেন। জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুরহাট অত্র এলাকার সবচেয়ে বড় হাট। প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার বসে এই হাট। যতদূর মনে পড়ে দিনটা ছিলো বৃহস্পতিবার। এই হাটেই বাবাসহ চাল বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলাম। তিলকপুর রেলস্টেশনে আসতেই দেখি প্রচুর লোকের সমাগম। তিল ধারণের জায়গা নেই, লোকজন বলাবলি করছে, শেখ সাহেব আসবেন, খুলনা মেলেই আসবেন, স্টেশন চত্বরে কিছুক্ষণ অবস্থান করবেন। আব্বা বললেন,"বা রে শেখ সাহেবকে দেখেই যাই"। কিছুক্ষণ পর ট্রেন স্টেশনে থামার সাথে সাথে জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেলেন শেখ মুজিব। আমার বাবা আর আমি মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে শেখ মুজিবকে দেখতে পেলাম না। আর আগে তো

কখনো দেখাই হয়নি। তখন আমার বাবা উচ্চস্বরে বললেন, কে রে বা শেখ মুজিব লোকটা কে বা লোকটা কে রে? এ কথা হাজার ভিড়েও উনি শুনতে পেরেছেন। শোনার পরেই তিনি ট্রেন থেকে নেমে পড়েছেন, চাচা আমি শেখ মুজিব। আমার বাবা ওনাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "অনেক বড় হও বাবা, তোমার কাজের সফলতা আসুক, তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করছি"। এ ঘটনা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

এরপর বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনলাম। ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধুর সেই প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল। তিলকপুর রেলস্টেশনে যাকে দেখেছিলাম, তিনিই বঙ্গবন্ধু, তাঁরই উদাত্ত আহ্বানে, আর ঘরে থাকতে পারলাম না । ১৯৭১ সালের ১৫ জুন কাউকে না জানিয়ে বন্ধুদের সাথে পালিয়ে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার বাগজানা সীমান্ত পার হয়ে কামারপাড়া ক্যাম্পে ভর্তি হলাম (আবু সাঈদ স্যারের অধীনে ৭নং সেক্টর)। ঐখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষিত মুক্তিবাহিনীর সাথে পূর্ব পাকিস্তানের পাগলা দেওয়ান (বর্তমানে নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলা) ক্যাম্পে আসি। এখানে কয়েকদিন যুদ্ধ করে পাকিস্তানি ক্যাম্প দখল করি। এখানে অনেক সহযোদ্ধাকে হারিয়েছি। এরপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কামারপাড়া ক্যাম্প হয়ে পতিরাম ক্যাম্পে আসি। ওখান থেকে শিলিগুড়ির পানিঘাটা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে তরঙ্গপুর ক্যাম্পে অস্ত্র নিয়ে তুলশীপুর ক্যাম্প হয়ে আবার ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানের দেওয়ান ক্যাম্পে (বর্তমানে নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলা) আসি। এরপর বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে অংশ নিয়ে বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানা আক্রমণ করি। এই আক্রমণে আমাদের দলের তিনজন যোদ্ধা শত্রুর গুলিতে গুরুতর আহত হন। আহত তিনজনকে কাঁধে নিয়ে শ্যামপুর ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। পরবর্তীকালে আমরা আবার ১২ ডিসেম্বর আদমদীঘি থানা আক্রমণ করি এবং শত্রুমুক্ত করি। আমি বিশ্বাস করি মা মাটি মানুষ - মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা এই নামগুলি একসূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে বঙ্গবন্ধুর নাম কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।

স্মৃতিকথন-১০৬

সংস্থার নাম: পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: খাদেরগাঁও, দক্ষিণ মতলব, চাঁদপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মুকবুল হোসাইন

মুক্তিযুদ্ধকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে আমি সিপাহী পদে কর্মরত ছিলাম। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ৮নং সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করি। সেই সময় সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবুল মঞ্জুর এবং সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আবুল ওহাব। যুদ্ধকালীন যশোরের মাগুরাতে অবস্থান করি। যশোর হয়ে বেনাপোল দিয়ে ভারতের ঢালী খোলা ক্যাম্পে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে উক্ত ক্যাম্প থেকে ৫নং রানীঘাট যুব ক্যাম্পে সহকারি প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। ঐ সময়ে ক্যাম্প সংলগ্ন নারায়নদিয়া গ্রামে পাকসেনারা আগুন ধরিয়ে দেয়, খবর পেয়ে আমরা অগ্রসর হতে থাকি। পাকসেনারা নড়াইল থেকে আসতে থাকে। পাকসেনাদের সাথে মোহাম্মদপুর হাইস্কুল মাঠে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে পাক সেনাবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবসর গ্রহণ করি।

স্মৃতিকথন-১০৭

সংস্থার নাম: এসকেএস ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বোয়ালী, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তসলিম সরকার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ও আমার কয়েকজন সহপাঠী মিলে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে অবস্থান করে রাতের বেলা মিটিং করি। সেখানে ২৫ জন সংগঠিত হয়ে রাতেই ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। দিনের বেলা আমরা শহরের একটি হিন্দু মন্দিরে অবস্থান করি। রাতের বেলা মসিহাট পথে পায়ে হেঁটে আমরা ভারতে পৌঁছাই। এরপর ভারতে প্রায় এক মাস অবস্থান করি।

এরপর ব্রিগেডিয়ার কমান্ডার মোঃ ফকির হাওলাদার-এর নেতৃত্বে আমরা টানা একমাস অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিই। তারপর চলে আসি বুড়িমারীতে। মুজিবক্যাম্পে অবস্থানের সময় বুড়িমারীতে পাকহানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধকালীন আমাদের কমান্ডারের নির্দেশে ডি-কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা এই লড়াই করি। এই যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর ৫ জন মৃত্যুবরণ করেন। সবচেয়ে বড় ঘটনা এই যে যুদ্ধে ডি-কোম্পানির কোন সদস্য মারা যায়নি, এমনকি কোন সদস্য গুরুতর আহতও হয়নি।

স্মৃতিকথন-১০৮

সংস্থার নাম: এসকেএস ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ভরতখালী, সাঘাটা, গাইবান্ধা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ মহিদুল ইসলাম

২০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বাড়ি থেকে ৫/৬ জন বন্ধু মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য রওনা হই। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো। কথাটা আমাদের কাছে প্রথমে সহজ মনে হয়েছিলো। কিন্তু সেই সময়ের বাস্তবতা ছিলো খুবই কঠিন। দুই দিন এক রাত পথ চলার পর ভারতের মেঘালয় রাজ্যে প্রবেশ করি। সেখানে গিয়ে জানতে পারি বাংলাদেশ বড়াইমাড়ী বিওপিতে কিছু লোক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে ক্যাপ্টেন আজিজ সাহেবের নেতৃত্বে। আমরা বরাইমাড়ী ক্যাম্পে চলে আসি। আস্তে আস্তে লোক বেশি হতে থাকে। সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে আমাদের খুব কষ্ট করে থাকতে হয়েছে। খাবার কষ্ট ছিলো আরো ভয়াবহ। ডাল রান্না হওয়ার সময় দেখলাম জরাপোকা ও হাতিয়া কালো পোকা ডালের ওপর ভেসে আছে। যিনি রান্না করছিলো সেই ভাইকে বললাম পোকাগুলো বড় চামচ দিয়ে তুলে ফেলে দিন। উত্তর পেলাম ফেলে দিলে খাবে কি? সব ডাল তো পোকায় খেয়ে ফেলেছে। পোকা থাকলে ওর পেটে হয়তো কিছুটা ডাল অবশিষ্ট আছে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়ে ৪ ডিসেম্বর বেলা ১২ টার সময় সংবাদ পাওয়া গেল কিছুক্ষণের মধ্যে ফুলঘাট এলাকায় পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ করতে হবে। তৈরি হওয়ার জন্য আদেশ পাই, কিন্তু সকাল থেকে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, শুধু সংবাদ আসে তোমাদের জন্য আজ গরুর মাংস রান্না হচ্ছে। খুব খুশি আজ ভাল খাওয়া হবে। কিন্তু খাওয়া আর হয় না। যাওয়ার স্থানও বলা হলো না। মাংস সম্পূর্ণ রান্না না হওয়ায় ঐভাবেই

মাংস খেয়ে রওনা হলাম। আল্লাহর রহমতে মুক্তিযোদ্ধার পেটে লোহা পর্যন্ত হজম হয়। বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যুদ্ধ করি। যুদ্ধের মাঝে অনেক গল্প আছে যা অনেক বড়। পরিশেষে আমরা ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করলাম।

স্মৃতিকথন-১০৯

সংস্থার নাম: এসকেএস ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কামালেরপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনজুরুল আলম তালুকদার

১৯৭১ সালের মে মাসের ২৫ তারিখে আমি কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর উপজেলাধীন কোদালকাটি গ্রামে একটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। সেখানে যুদ্ধকালীন আমার সহযোদ্ধারা ছিলেন মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল করিম, মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ সামাদ, মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাব হোসেনসহ আরো অনেকে। পাকসেনারা নদীপথে জাহাজ নিয়ে এসে কোদালকাটি গ্রামের ঘাটে ঘাঁটি তৈরি করে। খবর পেয়ে সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে আমরা সেখানে অপারেশন চালাই। আক্রমণের এক পর্যায়ে আমার পাশে অবস্থানরত সহযোদ্ধা ফজলুল করিমের বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে যায়। অসাবধানতাবশত তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। এমন সময় পাকবাহিনীর একটি গুলি এসে তাঁর বুকে লাগে। তিনি আমার কোলে ঢলে পড়েন। আমি অনেক কষ্টে টেনে-হিঁচড়ে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে যাই। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর পাকবাহিনী আমার সহযোদ্ধা আঃ সামাদ ও আলতাব হোসেনকে ধরে ফেলেন। তাঁদের দুইজনের কোমর জাহাজ নোঙ্গর করার রশি দিয়ে বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়ে জাহাজ ছেড়ে দেয়। জাহাজের সাথে সাথে রশি দিয়ে বাঁধা তাঁদের দেহ দুইটি ডুবতে ডুবতে চলে যায়। আমার চোখের সামনে ৩ জন সহযোদ্ধার এমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আমার হৃদয়কে ভেঙে খান খান করে দিয়েছিলো। আমার চোখের পানি ও বুকফাটা আর্তনাদ দেখার যেন কেউ ছিলো না। তারপরেও আমরা কেউ থেমে থাকিনি, যুদ্ধ করেছি মহা বীরবিক্রমে। এই অপারেশনে ১৯ জন পাকসেনা নিহত ও ৬৪ জন পাকসেনা আহত হয়। মৃত ও আহতদের নিয়ে পাকসেনারা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়। সেই স্মৃতি আজো আমার হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে।

স্মৃতিকথন-১১০

সংস্থার নাম: এসকেএস ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সাঘাটা ইউনিয়ন, সাঘাটা, গাইবান্ধা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল মান্নান মন্ডল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সময় আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। আমার স্ত্রী, পিতা-মাতা, বৃদ্ধ দাদি ও ভাইবোনদের বাড়িতে রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমি মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কারণে আমার পরিবার পাকহানাদার বাহিনীর ভয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়াতো। আমি মুক্তিযুদ্ধে থাকাকালীন আগস্ট মাসে আমার স্ত্রী কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। তাকে একনজর দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে শ্বশুর বাড়িতে ছুটে আসি। পরদিন লোকমুখে আমার আসার খবর জানাজানি হলে দেরি না করে সেই রাতেই আমি রওনা হই রৌমারীর দিকে। আমি যখন জিনজিরাম নদীর মুখে পৌঁছাই তখন পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ চলছিলো। আমি সেই যুদ্ধের মধ্যে পড়ে যাই। দ্রুত নৌকা বেয়ে চলে যাওয়ার ফলে আমি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাই। কয়েকদিন পরে খবর পাই, পাকবাহিনী আমার খোঁজে গ্রামে এসে আমাকে না পেয়ে পাশের গ্রামের নিরীহ ৪ জন লোককে গুলি করে চলে যায়। খবর পাই, রাজাকাররা আমার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে বাজারের টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ায় আমার প্রসূতি স্ত্রীসহ বাড়ির সকলে না খেয়ে আছে। যুদ্ধের অনেক স্মৃতির মধ্যে এই ঘটনাগুলি আমাকে এখনও পীড়া দেয়।

স্মৃতিকথন-১১১

সংস্থার নাম: সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বাহাদুরশাদী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সিরাজউদ্দিন

আমি মোঃ সিরাজউদ্দিন, পিতা: মৃত আঃ লতিফ, মাতা: মৃত মফিজা খাতুন,

গ্রাম: খলাপাড়া, ডাকঘর: দক্ষিণবাগ, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর। আমি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩নং সেক্টরের আওতায় সেক্টর কমান্ডার মেজর কে এম সফিউল্লাহ ও সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে গাজীপুর জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। নিচে মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত দুটি যুদ্ধের ঘটনা তুলে ধরলাম।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কালীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত খলাপাড়া ন্যাশনাল জুট মিলের পক্ষ হতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে শীতের জামা কাপড় বিতরণ করা হয়। এ খবরটি খলাপাড়া ন্যাশনাল জুট মিলে কর্মরত বিহারী সিকিউরিটি অফিসার আব্বাসী ঘোড়াশাল রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থিত পাকসেনাদের ক্যাম্পে পৌঁছে দেন। এতে পাকসেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে ১লা ডিসেম্বর ট্রলারযোগে শীতলক্ষ্যা নদী পাড়ি দিয়ে নদীর তীরে অবস্থিত ন্যাশনাল জুট মিলে হামলা চালায়। এ সময় পাকসেনারা জুট মিলের ১৪২ জন নিরীহ কর্মকর্তা কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করে। উপজেলার কলাপাটুয়া গ্রামে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবরটি পৌঁছালে সাথে সাথে আমরা ৭০-৮০ জনের একটি দল খলাপাড়া ন্যাশনাল জুট মিলের দেয়াল টপকে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হই। যুদ্ধে পাকসেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ৩০-৩৫ জনের পাকহানাদার বাহিনীর একটি দল নরসিংদী জেলার পলাশ থানাধীন বিএডিসি হতে নৌকাযোগে শীতলক্ষ্যা নদী পাড়ি দিয়ে কালীগঞ্জ হয়ে পায়ে হেঁটে ঢাকার দিকে রওয়ানা দেন। কালীগঞ্জ উপজেলার কলাপাটুয়া গ্রামে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবরটি পৌঁছালে আমরা ৭০ থেকে ৮০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল ওদের পিছনে ধাওয়া করি এবং গুলি করতে করতে সামনে এগুতে থাকি। ঈশ্বরপুর গ্রামে পৌঁছলে আমরা পাকিস্তানিদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলি। শুরু হয় সম্মুখ যুদ্ধ। এ সময় আমাদের গুলি লেগে পাকিস্তানিদের সাথে অবস্থানরত এক রাজাকার নিহত হয় এবং পাক হানাদারদের গুলিতে আমাদের এক সহযোদ্ধা মোজাফ্ফর হোসেন আহত হন ও পরবর্তীকালে মারা যান। এ যুদ্ধে আমরা ৬ জন পাকবাহিনীর সদস্যকে আটক করি। অতঃপর গরু বাঁধার রশি দিয়ে বেঁধে জামালপুর কলেজ মাঠে নিয়ে আসি। ঐদিন রাতেই বেয়নেট চার্জ করে ওদের শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেই।

স্মৃতিকথন-১১২

সংস্থার নাম: সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্রাকটিসেস (সিদিপ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মূলগ্রাম, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক

১৯৭১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সংকটময় মুহূর্ত পার করতে হয়। ঐ দিন ২নং সেক্টরে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দলকে মেহারী গ্রামে অ্যামবুশ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এই অ্যামবুশে ২১ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ৪৩ জন আহত হয়। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনী যেমন উদ্যম ফিরে পায় তেমনি পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এটি আমার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।

স্মৃতিকথন-১১৩

সংস্থার নাম: কোস্ট ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: উত্তর ধুরুং, কতুবদিয়া, কক্সবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট (অবঃ) আবদুল কাদের

৩০ জুলাই ১৯৭১ রাতে আমরা শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ করার জন্য ইন্ডিয়ার তেলঢালা থেকে গাড়িতে করে রওনা দিয়ে সীমান্তের আমবাসা এলাকায় আসি। সেখানে আমরা একটা আক্রমণের রিহার্সেল করি। অতঃপর আনুমানিক রাত ১২ টার দিকে কামালপুরের দিকে রওনা হয়ে যাই। আমরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্বে কামালপুরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেই। তখন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিলো এবং আকাশে বিজলী চমকাচ্ছিলো। অনেক পানি অতিক্রম করে আমরা নিজস্ব আক্রমণ এলাকায় চলে আসি। সামরিক নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণ করতে গেলে পিছন থেকে আর্টিলারী সাপোর্ট দিতে হয়। আর্টিলারী শত্রুর পজিশনের

ওপরে বোমা নিক্ষেপ করবে, আমরা সম্মুখ থেকে শত্রুর ওপর আক্রমণ করে পরাজিত করবো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় আর্টিলারী বাহিনীর যারা ছিলো তারা শত্রুর পজিশন ঠিক করতে পারে নাই। আমরা যেখানে শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম সে জায়গার পাশাপাশি তারা বোমাগুলো নিক্ষেপ করে। ফলে সেখানে আমাদের বাহিনীর অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। তারপরেও আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হই। বৃষ্টি, বাতাস, মেঘের গর্জন, আর্টিলারী বোমাবর্ষণ, ট্যাংকের বোমা বর্ষণ, মেশিন গানের ফায়ারিং ডিঙিয়ে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রায় শত্রুর ১০০ গজ কাছাকাছি চলে যাই। সেখানে আমরা আরো কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হই। সেদিন চোখের সামনেই আমার কোম্পানি কমান্ডার সালাউদ্দিন মমতাজ, তাঁর অপারেটর, রানারসহ অনেকের শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায় আবার কারো কারো পেট বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঐ মুহূর্তে আমার একটা হাতে এবং একটা পায়ে অর্থাৎ শরীরের দুটি স্থানে গুলি লেগে যায়। আমি পজিশনে চলে যাই। পজিশনে যাওয়ার পরে প্রায় ভোর হয়ে যায়। পাকিস্তানিরা আবার আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। ঐ সময় আমরা পিছনের দিকে চলে আসি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের অনেকগুলো লাশের মধ্যে একটা লাশও আনতে পারি নাই। পরে আমি ভারতের গহীরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হই।

স্মৃতিকথন-১১৪

সংস্থার নাম: সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: দাইন্যা, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মহির উদ্দিন

বল্লার রামপুর বাজারের পূর্ব পাশে ডোবাইলগ্রামে ১৮-১৯ জন ছেলে রাজাকারে যোগ দেয়। আমরা না জেনে বল্লা বাজার দখল করার জন্য পজিশন নেই। ভোরবেলায় বল্লা থেকে রাজাকারেরা এসে আমাদের আক্রমণ করে এবং আমাদের সাথে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আমির আলী মাস্টার এবং মোতালেব নামে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। কাদের সিদ্দিকী এই মোতালেবের নাম

রেখেছিলেন রকেট। যাই হোক আমরা ১০-১২ জন প্রাণে বেঁচে যাই এবং বহেরতৈল ক্যাম্পে চলে যাই।

স্মৃতিকথন-১১৫

সংস্থার নাম: ইকো–সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: আউলিয়াপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্ষিতিশ চন্দ্র বর্মন

আমরা ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নে সাত বন্ধু মিলে ঢেপা নদীর পাড়ে ধনিপাড়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখার জন্য একত্রিত হই। তখন ছিলো শীতকাল। পাশের ইউনিয়নের ঝাড়বাড়ী গ্রামে এক সঙ্গে ২৫/৩০ জন হিন্দু যুবক-যুবতীকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। পাশের বালিয়া ইউনিয়নে পাক হানাদার বাহিনী ধর্ষণ ও লুণ্ঠন চালায়। আমাদের ইউনিয়নে এরকম ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য আমরা ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নের সাত-আটটি গ্রাম থেকে কিছু সংখ্যক যুবক একত্রিত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এছাড়াও, আমাদের ভল্লিবাজারের পাশে একটি হিন্দু পরিবারের চার জনকে সারি করে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে পাকহানাদার বাহিনী। পাকিস্তানি বর্বরতা ও নির্মমতার এই ঘটনা দেখার পর আমরা সাত জন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করি। এরপর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করি।

স্মৃতিকথন-১১৬

সংস্থার নাম: ইকো–সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বাচোর, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল সামাদ

ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার গোদাগাড়ী ইউনিয়নে পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, ট্যাংক, সাজোয়া

যান এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত মিলিটারি ক্যাম্প ছিলো। সেখান থেকে তারা যুদ্ধ পরিচালনা ও লুটপাট করতো। ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমরা মুক্তিযোদ্ধারা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে সন্ধ্যা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করি। মাইন পুঁতে ক্যাম্পটি ধ্বংস করা হয় এবং তাদেরকে পরাজিত করে সেখান থেকে উৎখাত করা হয়।

স্মৃতিকথন-১১৭

সংস্থার নাম: ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: জাবরহাট, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আজহার আলী

আমরা তিন বন্ধু মিলে নদীর ওপারের সাদামহল গ্রামের যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখার জন্য টাঙ্গন নদী পার হচ্ছিলাম। তখন সময় ছিলো বর্ষাকাল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অধ্যাপক গোলাম মোস্তফাকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর তার পরিবার লুকিয়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং তারা গরুর গাড়িতে করে বোঁচাগঞ্জের সেনিহারীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। রাস্তায় যাওয়ার সময় তাদের সাথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দেখা হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদেরকে গরুর গাড়িসহ টাঙ্গন নদীতে ভাসিয়ে দিলে গাড়িটি স্রোতের অনুকূলে ভাসতে থাকে। এ দেখে আমরা তিন বন্ধু মিলে গাড়িটিকে থামানোর চেষ্টা করি। অনেক চেষ্টা করার পর আমরা বহু কষ্টে গাড়িটিকে নদীর ঘাটে নিয়ে আসতে সক্ষম হই। ঘাটে এনে দেখি গাড়ির মধ্যে অধ্যাপক শহিদ গোলাম মোস্তফার স্ত্রী ও ৩ সন্তান রয়েছে। আমাদের তিন বন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে বেঁচে যায় অধ্যাপক শহিদ গোলাম মোস্তফার পরিবার। পরবর্তীকালে আমি এবং আমার বন্ধুরা মিলে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার প্রয়াস অব্যাহত রাখি।

স্মৃতিকথন-১১৮

সংস্থার নাম: প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: চরমটুয়া, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হানিফ মিয়া

নোয়াখালীর পশ্চিমে উদয়-সাধুরহাট ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের ওপরে রাজাকাররা ক্যাম্প ও বাংকার তৈরি করেছিলো। তারা স্থানীয় বিভিন্ন হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, এলাকায় লুটপাট ও মানুষজনের ওপর ব্যাপক অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতো। তারা জালাল চৌধুরী ও যশোদা কুমার মিস্ত্রিকে রাজাকারেরা ক্যাম্পে নিয়ে মারধর ও অমানবিক নির্যাতন করে। তাৎক্ষণিক আমাদের কমান্ডারের নির্দেশে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হই। আমরা একত্রিত হয়ে রাজাকার ক্যাম্প ঘেরাও করি ও রাজাকারদের আত্মসমর্পণ করতে বলি। রাজাকারেরা বলেন, আমরা কোরআন শপথ করেছি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবো না। আমরাও কিছুতেই পিছু হটবোনা, যে করেই হোক জালাল চৌধুরী ও যশোদা কুমার মিস্ত্রিকে রাজাকারদের হাত থেকে উদ্ধার করবোই। আমাদের কমান্ডারের নির্দেশে আমরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে তাদেরকে প্রতিহত করে সকল রাজাকারদের হত্যা করি এবং জালাল চৌধুরী ও যশোদা কুমার মিস্ত্রিকে উদ্ধার করি। ফিরে আসার পথে উদয়-সাধুরহাট ইউনিয়ন পরিষদের পাশে রাস্তার পানি নিষ্কাশনের পাইপের ভিতর থেকে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে গুলি করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে আমরাও পাল্টা গুলি ছুড়লে ঐ ব্যক্তি মারা যায়। এভাবেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি।

স্মৃতিকথন-১১৯

সংস্থার নাম: আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কাদিরপাড়া, শ্রীপুর, মাগুরা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমিন উদ্দীন

২৪ নভেম্বর ১৯৭১ বিকাল বেলা যুদ্ধকালীন কমান্ডার মারুফ ভাই, গেরিলা

কমান্ডার হাফিজ ভাইসহ ১০/১২ জন মুক্তিযোদ্ধা নাকোলে অবস্থান করছিলাম। এ সময় খবর পাই মাগুরা হতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুইটি গাড়ি লাঙ্গলবন্দ যাবে। আমি তখন রাধানগর ক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম। খবর পেয়ে বন্ধুবর এস এম হামিদ ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় নাকোল মির্জাবাড়ীর সামনে হাজির হই। কিছুক্ষণ পরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গাড়ি আমাদের সামনে পৌঁছাতেই মারুফ ভাই নির্দেশ দিলেন, 'ফায়ার ফায়ার'। আমরা গুলি শুরু করলাম, পাক সেনাবাহিনী কয়েকটা গুলিবর্ষণ করেই থেমে গেল আর আমরাও ফিরে এলাম ক্যাম্পে। ভোরে জানতে পারলাম একটা গাড়ি ওখানে বিকল হয়ে পড়ে আছে এবং ৫ জন আহত ও ১ জন মারা গেছে। পরের দিন সকাল ৯টায় সাঁজোয়া বহর নিয়ে পাকবাহিনী আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের না পেয়ে ঘাসিয়াড়া কমলাপুর গ্রামসহ নাকোর বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমরা দিশেহারা হয়ে ভাবছিলাম কী করা যায়। এ সময় আমরা মাত্র ৪ জন উপস্থিত ছিলাম। হাবিলদার মান্নান ভাই কমান্ড করে বললেন, 'সামনে হাঁটো, ওদের মারবো না হয় মরবো'। আমরা দৌড় দিয়ে কাদিরপাড়া খালের কাছাকাছি এসে দেখি খালপাড় দিয়ে অনেক লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। মান্নান ভাইয়ের কাঁধের মেশিনগানটা আমাকে দিয়ে বললেন, 'গুলি শুরু কর, যা আছে কপালে।' নির্দেশ পেয়ে আমি গুলি করতে শুরু করি। গুলিতে পাক সেনাবাহিনীর ৪ জন সৈন্য আমি নিজ হাতে হত্যা করতে সক্ষম হই।

স্মৃতিকথন-১২০

সংস্থার নামঃ আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ নারিকেলবাড়িয়া, বাঘারপাড়া, যশোর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মশিয়ার রহমান

যুদ্ধ করতে গিয়ে নড়াইল জেলার কোলাগ্রামে ০৯ জনের একটি দল আলবদরদের হাতে ধরা পড়ি। তখন প্রায় দুপুর একটা বাজে। তাদের মধ্যে একজন ভালো লোক ছিলো। সে অন্য সকলকে বুঝিয়ে আমাদেরকে তাদের ওস্তাদের কাছে পাঠায়। ওস্তাদ তখন বাড়িতে ছিলো। ওস্তাদ আমাদের এক

এক করে পরিচয় জানতে চায়। আমাকে ও পাশের গ্রামের অপর এক ভাইকে সে ও তার স্ত্রী চিনতে পারে। তখন সে কারো সাথে কোন আলোচনা না করে ঘরের মধ্যে সকলকে আটকে রেখে বাইরে থেকে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। তখন আমরা ভয়ে সকলে অস্থির। দুইঘণ্টা পরে তার স্ত্রী মুড়ি, চানাচুর ও পানি রেখে যায়। রাত ৮টার দিকে মাছ ও ডিম দিয়ে ভাত খেতে দেয়। আমরা সকলে আল্লাহর কাছে শুধু প্রার্থনা করছি। রাত একটার দিকে ওস্তাদ নিজেই ঘরের দরজা খুলে দিয়ে সকলকে লাইন হয়ে সামনের দিকে হাঁটতে বলেন। অন্ধকারের মধ্যে আধাঘণ্টার বেশি সময় হাঁটার পর সকলকে এক নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। তারপর সকলকে নদীতে নামতে বলে। আমরা তখন কেউ কিছু বুঝতে পারছিলাম না আর কিছু ভাবার সুযোগও ছিলোনা। কোমর পানিতে নামার পর সে সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বলে। তখন শুধু ভাবছিলাম এই বুঝি গুলি এসে আমার বুক ঝাঁঝরা করে দিবে। এমন সময় ঐ লোকটি ফিসফিস করে বলে উঠে, 'এক সাঁতারে নদীর ওপারে চলে যাবে। এদিকে আর কখনও আসবেনা।' সেদিন সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে জীবন ফিরে পাওয়ার কথা মনে হলে শরীরে এখনও কাঁটা দেয়।

স্মৃতিকথন-১২১

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ নয়নশ্রী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মাইনুদ্দিন

আমার বয়স তখন ২৬ বছর। আমার গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার মেঘলা গ্রামে। পদ্মার পাড়েই আমাদের বাড়ি ছিলো এবং যুদ্ধের সময় আমাদের বাড়িতেই মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানা ছিলো। একদিন সংবাদ পেয়ে নৌকায় করে পাকসেনারা বেলা ১১-১২টার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিতে আক্রমণ করে। পাকবাহিনীর ভারী অস্ত্রের মুখে আমরা টিকতে না পেরে পালিয়ে যাই। পাকবাহিনীর সৈন্যরা আমাদের বাড়িসহ গ্রামের ৮-১০টি বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। সেদিনের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা কেউ হতাহত না হলেও মাধব কর্মকার নামে একজন সাধারণ

মানুষ পাকবাহিনীর গুলিতে নিহত হন।

সেদিনের পর হতে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ঐ ঘটনার বদলা নিতে সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। ভারী অস্ত্র ও গোলা-বারুদ জোগাড় করতে থাকি। এরই মধ্যে পাকবাহিনীর দুজন বেলুচ (বেলুচিস্থান) সৈন্য পাকবাহিনীর নারী নির্যাতন ও গণহত্যার ঘটনা সহ্য করতে না পেরে পাকবাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে এসে আমাদের সাথে যোগ দেয়। আমরা প্রথমে তাদের কথা বিশ্বাস করতে না পেরে তাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখি। পরবর্তীকালে তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর তাদের ওপর বিশ্বাস ফিরে পাওয়ায় তাদের সহযোগিতা নিয়ে হরিরামপুর উপজেলার হরিণা ক্যাম্পে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেই। বেলুচ সৈন্যরা পরামর্শ দেয় যে, পাকসেনারা দুপুরে খাওয়ার পর কিছু সময় বিশ্রাম নেয়। ঐ সময়ের মধ্যে আক্রমণ করতে হবে। ক্যাপ্টেন মোঃ হায়দার ও সাব-সেক্টর কমান্ডার গোলাম মহিউদ্দিন-এর নির্দেশে আমরা ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা তাদের কথা অনুযায়ী দুপুর বেলা চারদিক থেকে ক্যাম্প ঘিরে ফেলি। প্রথমে প্রহরীদের আটক করে মুখ বেঁধে ফেলি তারপর অস্ত্রাগার লুট করেই পাক সেনাদের ওপর গুলি করতে শুরু করি এবং ক্যাম্পের সকল পাকসেনাদের হত্যা করি। সেদিনের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হাতে ৭৮ জন পাকসেনা নিহত হয়েছিলো। আমাদের কোনো মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়নি। সেদিন আমরা হরিরামপুর উপজেলাকে পাকসেনাদের কবল থেকে মুক্ত করি।

স্মৃতিকথন-১২২

সংস্থার নামঃ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুওর (ডরূপ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ রাজাপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পর একদিন মেজর আবু তাহেরের নেতৃত্বে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ বর্ডারের কামালপুর থেকে দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ধানুয়া নামক স্থানের বাংকারে অবস্থান নিয়ে কামালপুর থেকে আসা পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ঐ যুদ্ধে আমরা হাবীব কোম্পানির মোট ৭২

জন মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করি। ঐদিন সকাল থেকে বেলা ১২ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত যুদ্ধ হয় এবং প্রায় ২০/২৫ জন পাকসেনা মৃত্যুবরণ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পাশের বাংকারে অবস্থানরত ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। আমি কমান্ডারের সংকেত না বুঝেই যুদ্ধ করতে থাকি, অতঃপর কমান্ডার হাবীব আমাকে জোর করে ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে পাকবাহিনীর নিকট ধরা পড়তে গিয়েও বেঁচে যাই। এখনও সেই যুদ্ধের কথা স্মরণ হলে আতঙ্কিত বোধ করি।

স্মৃতিকথন-১২৩

সংস্থার নামঃ কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ দৌলতদিয়া, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফজলুল হক প্রামাণিক

১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিলো ১৬ বছর। পবিত্র শবে বরাতের রাতে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে ভারতে প্রশিক্ষণ নেয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। পাঁচুরিয়া রেল স্টেশনের পাশে হাবিবুর রহমান নামক এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে ফরিদপুরের উদ্দেশে রওনা হই। ফরিদপুর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমার আওয়ামী লীগের সভাপতি জয়নাল আবেদিনের বড় ছেলে বাবলুর সাথে দেখা হয়। তার সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারি তিনিও প্রশিক্ষণের উদ্দেশে ভারতে যাচ্ছেন। তখন সবাই একসাথে যশোরের উদ্দেশে বাসে উঠে পড়ি। পথের মধ্যে মধুখালী থানায় কামারখালী ঘাটে পাকহানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাই। তখন আমাদেরকে বহু মানুষের সাথে স্পট ফায়ারিং এর জন্য লাইনে দাঁড় করানো হয়। তখন আমি একটা কৌশলের আশ্রয় নেয়। মুখ মলিন করে বলি যে আমরা আর্মি ক্যাম্পে মরিচ সরবরাহ করি। একথা শুনে ওরা আমাদের ৩ জনকে ছেড়ে দেয় এবং বাকিদের পাকবাহিনী গুলি করে মেরে ফেলে। তখন আমরা কামারখালী ঘাটে ভাসমান ব্রিজ পায়ে হেঁটে পার হয়ে যশোর বাগদা বর্ডার পার হই। বাগদা বর্ডার পার হওয়ার সময় ভারতীয় পুলিশ আমাদেরকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যান। থানায় যাওয়ার পর দেখি তৎকালীন রাজবাড়ী সরকারি কলেজের ভিপি আব্দুস সাত্তারও আটক

হয়েছেন। সেখানেই থানার মধ্যে উনার সাথে পরিচয় হয়। তখন সাত্তার সাহেব ৮নং থিয়েটার রোডে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি তাজউদ্দিন আহম্মেদ এর সাথে কথা বলে সবাইকে ছাড়িয়ে নেন এবং আমরা সকলে ভারতে মুক্তিযুদ্ধ শরণার্থী শিবিরের উদ্দেশে রওনা হই। শিবিরে আমরা ১ সপ্তাহ অবস্থান করি এবং ৫০ জনের ১টা দল বানাই। এরপরে দল নিয়ে পাঙ্গা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলে যাই। সেখানে ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ শেষ করে থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে টিমসহ রংপুর জেলা দিয়ে ঢুকে যুদ্ধ করতে করতে কুষ্টিয়া হয়ে রাজবাড়িতে অবস্থান নিই। ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর রাজবাড়ির অদূরে আহলাদীপুর ব্রিজের ওপর পাকহানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হই। তখন আমার পাশে খুশি নামের একটি ছেলে পাকহানাদার বাহিনীর গুলিতে শহিদ হন এবং আমার ডান হাতের কব্জিতে গুলি লেগে আমি আহত হই। পরবর্তীকালে আমি একটি স্বাস্থ্যশিবিরে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এখনো মনে পড়ে সেই উত্তেজনাকর দিনগুলোর কথা।

স্মৃতিকথন-১২৪

সংস্থার নাম: কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: খানখানাপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নাজিম উদ্দিন মিয়া

আমাদের কমান্ডারের পরিকল্পনা ছিলো গোয়ালন্দ রেলওয়ে কেউটিল ব্রিজে রাত ১১.০০টায় তিনদিক থেকে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের হামলা করবো এবং অস্ত্র লুট করবো। কমান্ডারের নির্দেশ ছিলো তার অনুমতিক্রমে প্রথম ফায়ার আমি করবো এবং এরপর বাকিরা তাদের ঘেরাও করে ফায়ার করবে। ট্রেনের পাশে লুকানো অবস্থায় আধো আধো জোছনার আলোয় আমি দেখতে পেলাম একজন রাজাকার গান গাইতে গাইতে আমার দিকে আসছে। তখন অবস্থা এমন হলো যে, আমি কমান্ডারের নির্দেশ নিয়ে ফায়ার করতে চাইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং আমাদের অপারেশনটি পণ্ড হয়েও যেতে পারে। তাই আমি কমান্ডারের নির্দেশের অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ সেই রাজাকারের ওপর গুলি চালাই। পরিকল্পনা মোতাবেক আমার

ফায়ারের পর দলের অন্যরাও নিজ নিজ অবস্থান থেকে ফায়ার শুরু করে। এই অবস্থা দেখে পাকিস্তানি সেনা ও বাকি রাজাকারেরা পানিতে লাফিয়ে সাঁতরে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ওদের আস্তানা থেকে ৫টি রাইফেল উদ্ধার করি এবং আনন্দে উল্লাস করি। পরদিন জানতে পারলাম, যে রাজাকারকে আমি মেরেছিলাম সে আমাদের এক সহযোদ্ধার আত্মীয়।

স্মৃতিকথন-১২৪

সংস্থার নাম: অর্গানাইজেশন ফর দ্য পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট (অপকা)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: করেরহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল আবছার

৯নং সেক্টর, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিলের নেতৃত্বে প্রায় বিশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সেক্টরকে তিনটি সাব-সেক্টরে ভাগ করে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। একদিন এয়ারপোর্ট এলাকায় একটা অপারেশনের জন্য গঠিত দলে আমি অংশগ্রহণ করি। রাতের বেলা কমান্ডারের নেতৃত্বে আমরা পাকবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমাদের দশজনের আক্রমণে পাকবাহিনীর ৪০ জন সদস্য নিহত হয়। ঐ দিনের অপারেশনের মাধ্যমে পাকবাহিনীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ঐসকল অস্ত্র দিয়ে আমাদের স্পেশাল মুক্তিবাহিনী পরবর্তীকালে অনেক অপারেশনে অংশগ্রহণ করে এবং মুক্ত করে অনেক এলাকা।

স্মৃতিকথন-১২৬

সংস্থার নাম: সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সখিপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা

বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলী সরদার

০৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে আমি যুদ্ধ করছিলাম সিলেটে। সেদিন সকাল

থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী সিলেটে বিমান হামলা চালায় এবং ভারতের কয়েকটি ঘাঁটিতেও হামলা চালায়। জবাবে ভারত ঐ দিন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর থেকেই আমাদের ব্যাটালিয়নের ১১ হাজার সৈনিকের শুরু হয় সিলেট দখলের পরিকল্পনা। ১১-১২ ডিসেম্বর ২ দিন না খেয়ে ১৩ ডিসেম্বর সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজের উত্তর পার্শ্বে আমরা এসে পৌঁছাই। কলেজের উত্তর পাশে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো। আমাদের থেকে দূরে খাদিমনগর এলাকায় তখন যুদ্ধ চলছিলো। এমসি কলেজে পাক সেনাদের ঘাঁটি ছিলো এবং তখন তারা বিশ্রাম করছিল। আমরা তাদের মত খাকি পোশাক ও হাতে চাইনিজ রাইফেল নিয়ে থাকায় তারা আমাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা মনে করেনি। তারা উর্দু ভাষায় চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কারা?' আমরা কোনো উত্তর না দিয়ে তাদের দিকে মেশিনগান তাক করে ধরলে তারা বুঝে যায় আমরা কারা। তারা দ্রুত গুছিয়ে নিয়ে ফায়ার ওপেন করে এবং সাথে-সাথে আমরাও গুলি চালনা শুরু করি। এরপর ভারতীয় বিমান এসে এমসি কলেজে হামলা চালায় এবং সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো ৪০ জন পাকসেনা নিহত ও বেশ কিছু সেনা আহত হয়েছে। আমাদেরও ৭ জন নিহত এবং ১৪ জন মারাত্মক আহত হয়। তাদের মধ্যে আমার খুব কাছের বন্ধু সিপাহী বাচ্চু মিয়া ও নুরনবী ওস্তাদ শহিদ হন। এমসি কলেজে যুদ্ধ শেষ করে আমরা আমাদের ব্যাটালিয়ন মিলে সিলেটের শায়েস্তাগঞ্জ হাইস্কুলে মিলিত হই। অনেক যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি, এখন আর হানাহানি চাই না। দেশের সব মানুষ যেন সুখে থাকে এটাই আমার বড় চাওয়া।

স্মৃতিকথন-১২৭

সংস্থার নামঃ কারসা ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর নগর (আগরপুর), বাবুগঞ্জ, বরিশাল

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাসান আলী

তখন সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিক। আমরা জানতে পারলাম, খুলনার গাবুরা, শ্যামনগর, কালিগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হামলা

চালাবে। ভয়ংকর এই খবরটা শুনে আমরা ক্যাপ্টেন এম এ জি বেগ এর নেতৃত্বে সংগঠিত হতে থাকি। এক পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হামলা করার আগেই আমরা তাদের মুন্সিগঞ্জ ক্যাম্পে অতর্কিত হামলা চালাই। সেখানে বিপুল সংঘর্ষ হয়। ক্যাপ্টেন এম এ জি বেগ এর নেতৃত্বে সম্মুখ যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পিছু হটিয়ে আমরা মুন্সীগঞ্জ ক্যাম্প দখল করি। এ সময় ৫-৬ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিহত হয়। এ ছাড়াও বেশ কয়েকজন রাজাকারকে আটক করা হয় এবং পরবর্তীকালে তাদেরকে গাছের সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করা হয়। এরপর আমরা সুন্দরবন হয়ে বরিশাল যাই এবং সেখানেও সম্মুখ যুদ্ধের মাধ্যমে বরিশালের ওয়াপদায় অবস্থানকারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করি।

স্মৃতিকথন-১২৮

সংস্থার নামঃ দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিল্লুর রহমান

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকালীন সময়ে করিমপুর থানাধীন শিকারপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এখনো সে ঘটনা আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাক সেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধের স্থানটি খুবই বিপদসংকুল ছিলো। শিকারপুর মুক্তিক্যাম্পের পূর্ব দিক বেষ্টন করে আছে মাথাভাঙা নদী। সংঘর্ষের কয়েকদিন আগে পাকসেনাদের অবস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কে খুব সতর্কতার সাথে খবর নেয়া হয়েছিলো। পাকসেনাদের ক্যাম্পের দূরত্বটা আমরা আগে থেকেই মগজে গেঁথে নিই। গভীর রাতে তাদের ক্যাম্পে অতর্কিত হামলা চালাই। পাকসেনাদের প্রাকপুর ক্যাম্প ছিলো অত্যন্ত শক্ত এবং তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছিলো অসাধারণ। কিন্তু আমাদের মর্টারের প্রচণ্ড আঘাতে তাদের ঘাঁটি মাটির সাথে মিশে যায়। আনুমানিক এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সেই মর্টারের হামলা চলমান থাকে

এবং ৪০-৫০টির মত মর্টার নিক্ষেপ করা হয়। মর্টারের হামলার সেই শব্দ এখনো আমি ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই।

স্মৃতিকথন-১২৯

সংস্থার নাম: এনডেভার

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: করগাঁও, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা ভুবন চন্দ্র দাশ

১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিলো ২০ বছর। আমি তখন টগবগে যুবক। ঐ বছর ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হত্যা খুন-নির্যাতনে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশ। পাকিস্তানের এই নির্মমতা দেখে আমি ক্ষোভে ফেটে পড়ি। ভেতরে-ভেতরে স্বপ্ন দেখতে থাকি স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার। স্বপ্ন দেখতে থাকি সোনার বাংলার। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ৫নং সেক্টরে সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর মোতালিব মিয়ার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তখন সুনামগঞ্জ জেলার বনগাঁও গ্রামে পাকসেনাদের ঘাঁটি ছিলো। সেক্টর কমান্ডারের আদেশ ছিলো সেই ঘাঁটিতে গ্রেনেড হামলা করার। প্রথমে আমি ও আমার এক সহযোদ্ধা অরণ্য দাশ মিলে ভিক্ষুক সেজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পাকবাহিনীর অবস্থান বের করি। তারপর আমার সহযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে রাত ১০টায় বিকল্প রাস্তা অবলম্বন করে পাক সেনাদের ক্যাম্পে আক্রমণ করি। ক্যাম্পে থাকা সব পাকিস্তানি সেনা মারা যান। আমরা সারারাত ধরে পুরোটা তাদের ক্যাম্প থেকে অস্ত্র লুট করি। এভাবে যুদ্ধ করে যাই নয় মাস। দেশ স্বাধীন করার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে তারপর ঘরে ফিরে আসি।

স্মৃতিকথন-১৩০

সংস্থার নাম: পিদিম ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: লছমনপুর, শেরপুর সদর, শেরপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সালাম

মৌলভীবাজার ক্যাম্প থেকে ইস্পাহানি চা বাগানের পাশ দিয়ে ২৫০

জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মেজর জিয়াউদ্দিন অন্য একটি মুক্তিক্যাম্পের দিকে যাচ্ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধার সেই বহরে আমিও ছিলাম। তখন ভরদুপুর। প্রচণ্ড গরমে আমরা সবাই ঘামছিলাম। সবাই একে অন্যের সাথে গল্প করতে করতে ঢিমে তালে আগাচ্ছিলাম। চা বাগানের পাশে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাস্তার দুই পাশে ফাঁদ পেতে রেখেছিলো। তাদের সেই ফাঁদে আমরা সবাই দুর্ভাগ্যজনকভাবে পড়ে যাই। ২৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা মিলে প্রায় ৭ দিন আমরা আটক ছিলাম পাকহানাদার বাহিনীর কাছে। আমাদেরকে দিনে মাত্র একবেলা খাবার দিতো। ২৫০ জনের বেশির ভাগকেই পরবর্তীকালে ওরা মেরে ফেলে কিন্তু আমি ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যাই। ভুলতে পারিনা সেই দিনগুলোর কথা। এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে পাকবাহিনীর অত্যাচারের কথা মনে পড়লে।

স্মৃতিকথন-১৩১

সংস্থার নামঃ আরডিআরএস বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ ভজনপুর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনছুর আলী

যুদ্ধ চলাকালীন কোন একদিন আমাদের বাড়ির পাশে ভজনপুর বাজারে বেড়াতে যাই আমি। সেখানে খাদেম আলী চেয়ারম্যান আমাকে জোর করে ট্রাকে তুলে তেঁতুলিয়া উপজেলায় নিয়ে যান। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্য, নিজের ইচ্ছায় আমরা ভজনপুর ইউনিয়নের অনেকে যুদ্ধে যোগদান করি নাই। বাজার থেকে জোর করে কম বয়সি যুবকদের ধরে নিয়ে যাওয়া হত তখন। আমাদের ধরে নিয়ে যেয়ে মেডিকেল টেস্ট করানো হতো। এরপরে নিয়ে যাওয়া হতো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে।

আমার মেডিকেল শেষ করে ভারতে মুজিব ক্যাম্পে প্রশিক্ষণে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৮ দিন প্রশিক্ষণের পর আমাদের শপথ গ্রহণ করান শেখ কামাল। তারপর আমরা নিউমাল জংশন থেকে ট্রেনে করে আসাম মেঘালয়ে আসি। ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে কামরূপ কামাখ্যা আসি। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দল বেঁধে তিনদিন পর মল্লার চর আসি। ওখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে ১২০

জন মুক্তিযোদ্ধা সাদুল্লাপুরের দিকে রওনা দেই। সেখান থেকে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় গাইবান্ধায় অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য। প্রায় ৫০ মাইল দূরে গাইবান্ধায় পায়ে হেঁটে যেতে আমাদের সময় লাগে প্রায় দুই দিন ও এক রাত। সেদিন ছিলো শবে বরাতের রাত। আমরা প্রায় দুই-তিন দিন অনাহারে ছিলাম। আমাদের অবস্থা ছিলো একেবারেই করুণ। তারপরও শুধুমাত্র কমান্ডারের নির্দেশ পালন করার জন্য আমরা এক গ্রামে ঢুকে যাই। গ্রামটি ছিলো পাকহানাদর বাহিনীর অধীনে। সেখানেই লুকিয়ে থেকে রাত পার করে দেই আমরা।

বেশ কিছুদিন লুকিয়ে থাকি আমরা। আমাদের নিয়ম ছিলো শুধু রাতে বের হওয়া। একদিন এক বাড়িতে খাওয়ার জন্য গিয়ে মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দিয়ে আমরা বললাম, 'ভাই আমরা তিন-চারদিন ধরে কিছুই খাইনি, দয়া করে আমাদেরকে কিছু খাবার দিন'। তখন তিনি বললেন, 'বাবা তোমাদেরকে খাবার দিলে আমাদের ছেলে-মেয়ে এবং এই গ্রামের কেউ বাঁচবে না। পাকসেনারা শুনলে বাড়ি-ঘর সব পুড়িয়ে ছাই করে দিবে'। আমরা বিমুখ হয়ে ফিরে আসলাম।

এক মেম্বার গাইবান্ধার পাকহানাদারদের খবর দেয় এবং তৎক্ষণাৎ ছয় সাতটি ট্রাক এসে আমাদের সম্পূর্ণ গ্রাম ঘেরাও করে এবং ফায়ারিং শুরু করে দেয়। সবকিছু ঘটে যায় প্রায় চোখের নিমিষে।

প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা গোলাগুলি চলার পর আমরা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। ছুটতে ছুটতে ঘাঘট নামক এক নদীতে চলে যাই আমরা। সেখানে মাঝিদের অনেক অনুরোধ করলাম, তবুও আমাদেরকে তাদের নৌকায় করে পার করে দিতে রাজি হলেন না। আমরা এরপর উপায় না দেখে জোর করে নৌকায় উঠে যাই এবং নদীর ওপার যাওয়ার সময় মাঝ নদীতে আমাদের নৌকা ডুবে যায়, তলিয়ে যায় আমাদের সাথে থাকা সব অস্ত্র।

দবির উদ্দিন নামের এক মুক্তিযোদ্ধা সাঁতার না জানার কারণে পানিতে ডুবে মারা যান। সাঁতরে নদী পার হই ঠিকই, কিন্তু প্রায় তিন চার দিন কোনো খাবার না পেয়ে আমরা সবাই দুর্বল হয়ে পড়ি। আমরা ৫০ জনের মত একটা দল একটি বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেই এবং সেখানেই বিশ্রাম নিতে থাকি। রাতের বেলায় খাবারের খোঁজে বের হব বলে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেই। এই

মুহূর্তে এক গ্রাম পুলিশ আমাদেরকে দেখে ফেললে আমরা বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটি গর্তে লুকিয়ে পড়ি। তখন সময় ছিলো প্রায় বিকেল ৫টা। হানাদার বাহিনীর দুটি ট্রাক এসে আমাদেরকে চারপাশ ঘেরাও করে ফেলে। তখন আমাদের কমান্ডার দিশেহারা হয়ে আমাদের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে বললেন, 'বাঁচার আর কোন উপায় নেই। যার যার কাছে হাত গ্রেনেড আছে, বুকের মধ্যে রেখে পিন আউট করবেন। কেউ ধরা দিবেন না'।

আমরা যে স্থানে লুকিয়ে ছিলাম সেখান থেকে মাত্র পাঁচ ছয় গজ দূরে পাকহানাদার বাহিনী অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় গালাগালি শুরু করে। আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে দোয়া ইউনুস পাঠ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা শুরু করলাম। তবে আল্লাহর ইশারায় পাকবাহিনী কোন এক অলৌকিক কারণে আমাদের খুঁজে পায় না।

হানাদার বাহিনী আমাদের না পেয়ে ওই গ্রাম পুলিশকে খুবই মারধর করে। হানাদার বাহিনী শেষমেষ পাশের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যা সাতটার দিকে গ্রামের মেম্বার এসে হঠাৎ কামাল বলে ডাক দিলেন। আমাদের ১২০ জনের মধ্যে একটি পাসওয়ার্ড ছিলো, সেটি হচ্ছে 'কামাল' আর তাই উনার ডাকে বিশ্বাস করে সাড়া দেই আমরা। উনি আমাদের দেখে বললেন, 'বাবারে, তোমরা এখনও বেঁচে আছ! আমি গাইবান্ধার পার্কে দেখে আসলাম বহু মুক্তিযোদ্ধাকে বেঁধে রেখে খুব মারধর করছে। মারধরের পর গাড়িতে পা বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' উনি আমাদের জন্য রুটি তৈরি করে নিয়ে আসলেন এবং আমাদেরকে খেতে বললেন। আমাদের খাওয়ার ইচ্ছে ততোক্ষণে মরে গেলেও একটু করে খেয়ে নিলাম। সেখান থেকে আমরা পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। সাত দিন-সাত রাত হেঁটে আমরা মল্লার চর ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যাই। ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে আসামে এসে সেখান থেকে শিলিগুড়ি হয়ে তেঁতুলিয়া চলে আসি। সেখান থেকে আবার আমাদের বেরুবাড়ি পোস্টিং দেয়া হয়। তার তিন মাস পর দেশ স্বাধীন হলে ঠাকুরগাঁও পিটিআই-এ আমরা সব অস্ত্র জমা দিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসি।

স্মৃতিকথন-১৩২

সংস্থার নাম: উদ্দীপন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কালীপুর, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইসহাক

আমি এসএসসি পাশ করার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে কর্পোরাল পদে চাকরি শুরু করি। আমার চাকরি জীবন ভালোই চলছিল। আমি মার্চ মাসে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলাম। ছুটি শেষ হয়েছিলো ২৪ মার্চ। কিন্তু ২৫ মার্চে ঢাকায় যোগদান করতে গিয়ে কালো রাত্রির হামলার শিকার হই এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে আমি নিজের এলাকায় ফিরে আসার পরিকল্পনা করি। আসার পথে ফেনীতে এসে হাজিসিয়া ক্যাম্পে অবস্থান নেই, তারপর সেখান থেকে বাঁশখালীতে চলে আসি। অতঃপর সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম ও সাব-সেক্টর কমান্ডার ডাক্তার আবু ইউসুফ চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি। প্রথমে আমরা রাস্তা-ঘাট বন্ধের কাজ শুরু করি যাতে করে পাকিস্তানিরা প্রবেশ করতে না পারে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজ এলাকা বাঁশখালীতে অবস্থান করি এবং এলাকার লোকজনদের রক্ষা করার চেষ্টা করি। আমরা পাহাড়ে ক্যাম্প স্থাপন করেছিলাম এবং দলবল নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, রাজাকার ও আলবদরদের প্রতিহত করতে থা-কি। অনেক রাজাকারদের হত্যাও করেছি। একদিনের ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। একদিন পাকিস্তানি কিছু সেনা ও রাজাকারের দল বাঁশখালীর গুনাগরীতে অবস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয়ে অবস্থান নেয়। সেইদিন আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ড আক্রমণ করে সারা রাত ধরে তাদের সাথে যুদ্ধ করি। তাদের সাথে আমাদের গোলাগুলি হয়। আমাদের আক্রমণে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এটা ছিলো আমার জন্য একটি অবিস্মরণীয় দিন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর কমান্ডারের নিকট অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি।

স্মৃতিকথন-১৩৩

সংস্থার নাম: আরডিআরএস বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: দেবীডুবা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন চন্দ্র বর্মন

সেদিন বাকি দিনগুলোর মতোই প্রশিক্ষণ শেষ করে নদীর পাড়ে সহযোদ্ধাদের সাথে বসেছিলাম। আমার মায়ের কথা প্রায়ই মনে পড়তো। ২২ বছরের যুবক তখন আমি। যুদ্ধ শুরু হবার আগে এই সময়টায় খেলতে যেতাম মাঠে। আমি আমার গ্রামের ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। আমি ছিলাম আমার গ্রামের একমাত্র গোলকিপার। পুরনো কথা ভাবতে ভাবতেই ইদ্রিস দৌড়ে আসলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'কাল অপারেশন। গাইবান্ধা জেলার দারিয়াবান্ধা এলাকার একমাত্র ব্রিজ গুড়িয়ে দিতে হবে।' শুনে উত্তেজনায় বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। পরের দিন যথাযথ জায়গায় আগেই চলে যাই আমরা। রাত ৩টা বাজে তখন। আমার দায়িত্ব ছিলো ব্রিজের গোড়ায় ডিনামাইট সেট করে দেওয়া। আমি ব্রিজের পিলারের নিচে ডিনামাইট সেট করে আবার আগের জায়গায় এসে বসে পড়লাম। কমান্ডারের নির্দেশমত চেপে দিলাম সুইচ। চোখের সামনে দেখলাম বিশাল বড় এক ব্রিজ ধ্বসে পড়লো। সেই দিনের কথা মনে পড়লে এখনো গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

স্মৃতিকথন-১৩৪

সংস্থার নাম: নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: চরসেনসাস, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ

আমি আব্দুল হামিদ, ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর ১১নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে সিও নাছিম সাহেবের নেতৃত্বে একজন রেগুলার ফোর্স হিসেবে কর্মরত ছিলাম। তখন আমার বয়স মাত্র ১৮ বছর। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে ভৈরবের কান্দুরা এলাকায় পাকবাহিনী হঠাৎ আক্রমণ চালায়। আক্রমণের

বিপরীতে আমরা তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করি। এমতাবস্থায় উভয়পক্ষের যুদ্ধ চলাকালে একটি শেল হঠাৎ সিও নাছিম সাহেবের বাম পায়ে বিদ্ধ হয় এবং সাথে সাথে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন আমি তার পাশেই ছিলাম, আমি আমার জীবন বাজি রেখে তাকে উদ্ধার করি। তার রক্তে আমার পুরো শরীর ভিজে যায়। পরবর্তীকালে তাকে ক্যাম্পে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এটাই ছিলো আমার যুদ্ধকালীন স্মরণীয় ঘটনা।

স্মৃতিকথন-১৩৫

সংস্থার নাম: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এ্যান্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: আলীনগর, কালকিনি, মাদারীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রব মিয়া

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে মাদারীপুর জেলাধীন সমাদ্দার ব্রিজ এ পাকসেনাদের গতিরোধ করতে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছি। ব্রিজ প্রথমে গুড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিলো আমাদের। কিন্তু রাতের বেলা ব্রিজে যাওয়ার আগেই পাকহানাদার বাহিনী সে খবর পেয়ে যায় আর আমাদের পথের মাঝখানে আক্রমণ করে। আমরা এক ভয়াবহ সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হই।

এই যুদ্ধে আমাদের সহযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা বাচ্চু ভাই শাহাদাৎ বরণ করেন। তাকে মাদারীপুর সরকারি কলেজের গেট সংলগ্ন স্থানে সমাহিত করা হয়। ঐ কবর দেখলে এখনো পাকবাহিনীর বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের কথা মনে পড়ে। যতদিন বেঁচে আছি পাকহানাদার বাহিনীর নির্যাতন, হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও এর কথা ভুলবো না।

স্মৃতিকথন-১৩৬

সংস্থার নাম: জাকস ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ধলাহার, সদর, জয়পুরহাট

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনছার আলী

হিলিতে যুদ্ধ চলাকালীন আমরা কয়েকজন যুবক মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র সহযোদ্ধাদের সহযোগিতার পাশাপাশি অপারেশনেও যেতাম। দিনটার কথা পুরোপুরি মনে নেই। পাক হানাদার বাহিনী আমাদের ওপর প্রবল আক্রমণ চালায়। আমি আমার মুক্তি বাহিনীর লাইনের পেছনে আধশোয়া ছিলাম। রাইফেলের গুলি যোগান দিচ্ছিলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা অনবরত গোলাগুলি চলে।

যুদ্ধ চলা অবস্থায় একদিন এক পাকবাহিনীর সেনা সদস্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে এবং তাকে চোখ বেঁধে ইন্ডিয়ান আর্মিরা গাড়িতে করে নিয়ে যায়। যাবার সময়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও আশেপাশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এক আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে আমি নিজেও ভীষণ আনন্দিত হই, যা আমার মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের সব থেকে স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

স্মৃতিকথন-১৩৭

সংস্থার নাম: নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: নওপাড়া, নড়িয়া, শরীয়তপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিন মাদবর

আনুমানিক দুপুর ২ টার দিকে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে তখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের মন্টু ভাই জানালেন, 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চাঁদপুর দিয়ে আইতাছে আমাদের আক্রমণ করার জন্য।' তিনি আমাদের

প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বললেন। আমরা তখন আমাদের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হই। ঠিক আধাঘণ্টা পর পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে আসে এবং এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। আমরাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করি। গুলির শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ৩ ঘণ্টা পাল্টাপাল্টি গোলাগুলির পর সেদিন পাকিস্তানি ৬০ জন সৈন্য মারা যায় এবং আমাদের দুইজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। পাকিস্তানি সৈন্যের একটি গুলি আমার মাথার পাশে আঘাত করেছিলো সেদিন। গুলি খেয়ে আহত হবার পরে আমি ক্যাম্পের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ঐদিনের যুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনী জয় লাভ করে।

স্মৃতিকথন-১৩৮

সংস্থার নাম: আরডিআরএস বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বেরুবাড়ী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম

১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর। খবর এলো পাকবাহিনী কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার খাদ্য গোডাউনে শক্ত খুঁটি গেড়েছে। আমরা ৫০ জন মুক্তিবাহিনী নাগেশ্বরীর অদূরে মাদারগঞ্জের ডাক বাংলো থেকে দেশ স্বাধীনের মহান ব্রত নিয়ে অবস্থান করছি। কোম্পানি কমান্ডার নান্নু মিয়া সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'কে আছেন যিনি নাগেশ্বরী খাদ্য গোডাউন থেকে পাকবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কিত খবর আনতে পারবেন?' সেদিন ঐ দুঃসাহস শুধুমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারেনি। আমি চোখ-মুখ শক্ত করে বললাম, 'আমি প্রস্তুত দেশের জন্য।'

চানাচুরওয়ালার ছদ্মবেশে আমি বেড়িয়ে পড়লাম নাগেশ্বরী খাদ্য গোডাউনের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে বোয়ালের ডারায় পাকবাহিনীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তবে আমি সাহস হারাইনি।

পাকবাহিনী: এই ছোকরা তুমারা ঝোলি মে ক্যায়া হ্যায়?

আমি: জি সাব, চানাচুর, আপ খায়েংগে?

পাকবাহিনী: দো।

চানাচুর খাওয়ার পর পাকবাহিনী আবার আমাকে জেরা শুরু করে।

পাকবাহিনী: তুম কিধার যাতা হ্যায়?

আমি: নাগেশ্বরী।

এই বলে আমি আর কোন দিকে না তাকিয়ে সামনে হাঁটা ধরলাম। চললাম গন্তব্যস্থল নাগেশ্বরীর উদ্দেশ্যে। পৌঁছে গেলাম খাদ্য গোডাউনের গেটে। গেটে দেখা মিললো আরেক পাঠানী পাকসেনার। আমাকে দেখা মাত্র কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুম মুক্তিফৌজ হ্যায়?' উত্তরে বললাম, 'জি না সাব, হাম চানাচুরওয়ালে। গরীব আদমী।'

এভাবে চানাচুরওয়ালার ছদ্মবেশে আমি খাদ্য গোডাউনের ভিতরে পৌঁছে যাই। দেখি ০৬ রেঞ্জের মর্টার ঠিক আমাদের মাদারগঞ্জের দিকে তাক করা। সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে চলে আসলাম কোম্পানি কমান্ডারের নিকট।

পরের দিন ভোর বেলা আমরা আমাদের তাঁবু উঠিয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় স্থাপন করলাম। ঠিক ঐ দিন সকাল ৯:০০ টায় শুরু হলো পাকবাহিনীর ৬ নম্বর রেঞ্জের মর্টারের মাধ্যমে তাণ্ডবলীলা। আমার দুঃসাহসিকতায় বেঁচে যায় ৫০ জন মুক্তিবাহিনী।

স্মৃতিকথন-১৩৯

সংস্থার নাম: উদ্দীপন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: পাড়েরহাট, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌতম হালদার

পিরোজপুর জেলার জুসখোলা গ্রামের হিন্দু পরিবারের এক সুন্দরী গৃহবধূ ছিলো। তার নাম ছিলো ভাগীরথী। যুদ্ধ চলাকালে পাকহানাদার বাহিনী ভাগীরথীকে তার ছোট্ট শিশুসহ ক্যাম্পে তুলে নিয়ে তাকে শারীরিক নির্যাতন করে। তাকে তাদের ক্যাম্পে বন্দি করে রাখে। ভাগীরথী এক পর্যায়ে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সিদ্ধান্ত নেয় যে আমার জীবনতো শেষ; আমার

জীবনের বিনিময়ে হলেও এ দেশকে স্বাধীন করতে হবে। তাই পাকহানাদার বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্যাম্প থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যাম্প থেকে পালানের সময় সে পাকহানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পরে। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ভাগীরথীকে তাদের গাড়ির সাথে বেঁধে রাস্তায় টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায়। তাতে ভাগীরথীর শরীরের হাড্ডি আর মাংস আলাদা হয়ে তিনি শহিদ হন। তখন তার দুধের শিশু তার মায়ের লাশের ওপরে উঠে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। এ দৃশ্য আমি দূর থেকে পালিয়ে অবলোকন করি। তখন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। সেদিন শপথ নিয়েছিলাম - এ দেশ থেকে কুকুরদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত আর ঘরে ফিরবো না। উক্ত ঘটনাটি আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিলো।

স্মৃতিকথন-১৪০

সংস্থার নামঃ এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বড়তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ছানোয়ার হোসেন

১৯৭১ সালের সাত মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভা হতে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার ঘোষণা পেয়ে গিয়েছিল। আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। তারপর ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলে আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে চিন্তা করি কিভাবে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শত্রুর মোকাবিলা করা যায়। এপ্রিলের এক তারিখে অনেক কষ্ট করে ভারতের কুরমাইল কামারপাড়ায় গিয়ে দেখি আমার এলাকার আরো দুইজন- মোঃ আব্দুল মান্নান (সূর্যবান) ও মোঃ আজাহার আলী (কানপাড়া) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য লাইনে প্যারেড করছিলো। আমাকে দেখে তারা প্রশিক্ষণ কমান্ডার-কে অনুরোধ করেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভর্তি করে নেয়ার জন্য। এরপর ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেমন কালিগঞ্জ, রায়গঞ্জে শারীরিক ও অস্ত্র গোলা বারুদ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। তারপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পানিঘাটা, শিলিগুড়ি যাই। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি

জেনারেল এমএজি ওসমানী ও ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডারের উপস্থিতিতে শপথ শেষে ভারতের তরঙ্গপুর অপারেশন ক্যাম্পে যোগদান করি। এরপর সাত নম্বর সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের অধীনে বিভিন্ন সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সর্বশেষ যুদ্ধের এলাকা ছিলো চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

স্মৃতিকথন-১৪১

সংস্থার নাম: দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: দুর্গাপুর ইউনিয়ন, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পূর্বে মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে পরিচালনা করতে হবে তার ওপর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে আমার কোম্পানিকে ১১নং সেক্টরের বর্তমান নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর সীমান্তে পাঠানো হয়। সেখানে বেশ কয়েকদিন আমরা অবস্থান করি। ৫ দিন পর আমরা জানতে পারি পাকবাহিনী দূর্গাপুর সীমান্তে ক্যাম্প গড়ে তুলেছে। আমার কোম্পানির সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিলো ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও সীমান্তবর্তী গ্রামে। পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে পাকবাহিনীর ৯ জন নিহত হয়। আমাদের মধ্যে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা ঘটনাস্থলে শহিদ হন। শহিদ হওয়া দুই মুক্তিযোদ্ধা একটি কচুক্ষেতে অবস্থান নিলে পাকবাহিনী দেখে ফেলে এবং তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়াও, পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে তারা হামলা করে ৫ বছরের একটি মেয়েশিশুসহ একই পরিবারের ৫ জনকে হত্যা করে। উক্ত মর্মস্পর্শী ঘটনা আমাদেরকে আরো উদ্বুদ্ধ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী থেকে দেশকে মুক্ত করতে। পরবর্তীকালে আমরা দূর্গাপুর সীমান্তে পাকিস্তানি ক্যাম্পে আক্রমণ করে ক্যাম্পটি ধ্বংস করতে সমর্থ হই।

স্মৃতিকথন-১৪২

সংস্থার নাম: পল্লী প্রগতি সমিতি

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: জৈনকাঠী, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইদ্রিস সিকদার

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সেপ্টেম্বর মাসের শেষে পটুয়াখালী সদর থানার শান্তি কমিটির সভাপতি মোতাহার খন্দকার ও থানার সেকেন্ড অফিসারের নেতৃত্বে ৯ জন পুলিশ ও কতিপয় রাজাকারসহ একদল পাকবাহিনীর দোসর মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার জন্য ২টি নৌকাযোগে মুরাদিয়ার গাবতলী গ্রামের সিকদার বাড়ির ঘাটে দুপুর ১.৩০ মিনিটে পৌঁছে। 'কাজী আবদুল মতলেব মুক্তিবাহিনী' দল তখন ফেদিয়ার খালের মুখে নৌকাতে দুপুরের খাবার রান্নায় ব্যস্ত। এক লোক এসে মতলেব কাজী সাহেবের কাছে খবর দেয় যে সিকদার বাড়ির ঘাটে রাইস মিলের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার জন্য পুলিশ ও রাজাকার নৌকা নোঙর করেছে। মতলেব কাজী সাহেব তাৎক্ষণিক ৪টি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলসহ ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা সেনা যথাক্রমে আবদুল হাই, জয়নাল আবদীন, পুলিশ আঃ লতিফ তালুকদার, পুলিশ ইউসুফ আকন ও আবদুস সোবাহানকে ঘটনা স্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে তিনজন দুইটি রাইফেল নিয়ে ঘাট থেকে কিছু দূরে খালের অপর পাড়ে অবস্থান নেয়। অবশিষ্ট দুইজন খালের এপাড়ে বাকি দুইটি রাইফেল নিয়ে অবস্থান নেয়। পরে দুপুর ২টায় পুলিশ ও রাজাকারের দুইটি নৌকা পুনরায় সিকদার বাড়ির ঘাট থেকে ছেড়ে উত্তরে যাত্রা করে। তখনই আঃ হাই ফায়ার করার নির্দেশ দেন। আঃ হাই সরাসরি নৌকা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে দারোগা সরফরাজ পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। পরে উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়ে আরো এক পুলিশ বাহুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। দুই রাজাকার ঘটনাস্থলে গুলিতে নিহত হয়। পরে পুলিশ ও রাজাকার পাশে থাকা ধানক্ষেত দিয়ে পলায়ন করে। ধানক্ষেতে গ্রামের জনগণ এক রাজাকারকে হত্যা করে। যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা ৮টি রাইফেল ও গুলি উদ্ধার করে।

স্মৃতিকথন-১৪৩

সংস্থার নাম: ওসাকা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সাহাপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক বিশ্বাস

পাবনা জেলার অন্তর্গত একটি থানা ঈশ্বরদী। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঈশ্বরদী পুলিশ স্টেশনে পাকিস্তানি পুলিশ ও মিলিশিয়ারা অবস্থান করছিলো। এদেরকে আক্রমণ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা কমান্ডার মোঃ হাশেমের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবির হতে আমিও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। তখন আমার বয়স ছিলো ১৫ বছর। আক্রমণের আগের দিন রাতে কমান্ডার মোঃ হাশেমের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মূলত আলোচনা হয় কিভাবে আমরা পাকিস্তানি পুলিশ ও মিলিশিয়া বাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণ করে পরাস্ত করতে পারি। সভায় কমান্ডার মোঃ হাশেম আমাদের বিভিন্ন ধরনের কৌশল শিখিয়ে দেন। কৌশল মোতাবেক আমরা ঈশ্বরদী পুলিশ স্টেশনে চতুর্দিক হতে অতর্কিত আক্রমণ করি। এতে ১১ জন পাকিস্তানি পুলিশ নিহত হয়। ঘটনাটি আজও আমার স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আজ আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। এটি আমাদের কাছে অনেক গৌরব ও সম্মানের।

স্মৃতিকথন-১৪৪

সংস্থার নাম: ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: শুকুন্দি, মনোহরদী, নরসিংদী

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক বিশ্বাস

১৯৭১ সালের মে মাসে ৩ জন গ্রুপ কমান্ডার এর সাথে ভারতে যাই। ভারত থেকে নৌকা করে গোলাবারুদ নিয়ে আসার পথে কুমিল্লা সতুরা ব্রিজের নিচ দিয়ে যখন সিংগার বিলে প্রবেশ করি, তখন পাকসেনারা টের পেয়ে আমাদের রেইড করে। এতে নৌকার চালক এবং একজন গ্রুপ কমান্ডার তাদের গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করে। সেসময় আমি এবং আমার

একজন সহকর্মী নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে অনেক কষ্টে নিজেদের আত্মরক্ষা করি। দুইজনকে মৃত অবস্থায় ফেলে রেখে আমরা চলে আসি। তারপর বি-বাড়িয়াতে দুই দিন ধানক্ষেতের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করি। তখন আমাদের খাবারের খুব কষ্ট হয়। দুইজন ছোট বালক রাতের আধারে কিছু চাল ভাজা আর পানি সরবরাহ করে। দুইদিন দুইরাত ধানক্ষেতে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ি। ধানক্ষেতে সার দেওয়া ছিলো তাই সারা শরীরে ঘা হয়ে গিয়েছিলো, পরে সেখান থেকে নিজ এলাকায় ফিরে আসি। কিছুদিন পর আমার পাশের এলাকার (কাঁচিকাটা গ্রাম) এক বাড়িতে পাকবাহিনী রাজাকারের সহায়তায় নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করে। খবর পেয়ে সেখানে আমি একাই ছুটে যাই এবং বাড়ির ওপর দিয়ে দুইটি ফাঁকা ফায়ার করি। পাকবাহিনী হয়তো মনে করে আমরা মুক্তিবাহিনীর একটা দল চলে এসেছি, তাই তারা খুব দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। পরে আমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি কারো কোন ক্ষতি হয়নি। এরপর দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে বিজয়ের বেশে দেশে ফিরে আসি।

স্মৃতিকথন-১৪৫

সংস্থার নামঃ এফআইভিডিবি

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ হাটখোলা, সিলেট সদর, সিলেট

বীর মুক্তিযোদ্ধা মছদ্দর আলী

আমরা রাধানগর চা বাগানে আজির উদ্দিন চেয়ারম্যানের মহিষের ঘরে থেকে যুদ্ধ করি একটানা দুই মাস। যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের আস্তানায় অতর্কিত আক্রমণ করে দখল করে নেয়। আমরা পিছু হটে লনীবস্তি ছাতার গ্রামে পালিয়ে যাই। সেখানে আমরা নতুন করে সংঘবদ্ধ হতে থা-কি। তখন আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কমান্ডার মোঃ আবু জাফর সাদিক। পরবর্তীকালে দুই-তিন দিন পর ডাউকি থেকে আর্টিলারি বোমা ফেলে পুনরায় আমরা আমাদের আস্তানা দখল করি। দখল করার পর বাংকারের ভিতর থেকে বস্ত্রহীন মহিলাদের উদ্ধার করি। পরবর্তী সময়ে আমরা রাধানগরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাতুরে একটি ক্যাম্প স্থাপন করি। সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন

সময়ে অনেক সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়েছিলাম। অবশেষে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করেছিলাম যা বাঙালির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

স্মৃতিকথন-১৪৬

সংস্থার নাম: এফআইভিডিবি

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ছৈলা আফজলাবাদ, ছাতক, সুনামগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রজব উদ্দিন

দোয়ারা উপজেলার বাসতলা ক্যাম্প হতে আব্দুল হক সাহেবের নির্দেশে আমাদের ৭২ জনকে শিলং হতে ইকোয়ান নিয়ে যাওয়া হয়। ইকোয়ানে ২৮ দিন প্রশিক্ষণ শেষে আমাকে তাহিরপুরের বড়ছড়ায় প্রেরণ করা হয়। আমরা অক্টোবর মাসের দিকে তাহিরপুরকে দখলদার বাহিনীমুক্ত করার জন্য দখলদার বাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হই। প্রথম প্রচেষ্টায় আমরা তাদেরকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হই। উক্ত সম্মুখ সারির যুদ্ধে আমাদের দুইজন ভাই শহিদ হন। পরবর্তীকালে আমরা পার্শ্ববর্তী সাইদেনতলা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করি। সেখানে ৭ দিন অবস্থান করে পুনরায় তাহিরপুরকে দখলদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণ করি। এবার আমরা সফল হই। আমি আমার উরুতে গুলিবিদ্ধ হই এবং সেদিনই তাহিরপুর হানাদার মুক্ত হয়। এখনো আমার উরু অবশ অবস্থায় আছে, তবে হাঁটাচলা করতে পারি।

স্মৃতিকথন-১৪৭

সংস্থার নাম: ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: চাকলা, বেড়া, পাবনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল বারী

আট এপ্রিল ১৯৭১ বেলা ১২.০০টার সময় আমরা জানতে পারি, পাবনার যমুনা নদীর ওপারে ভেড়াকোলা দীপপুর গ্রামে পাকহানাদার বাহিনী রাজাকারের সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে ক্যাম্প স্থাপন করেছে। সেদিন সন্ধ্যায় দুইজন মুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে দীপপুর গ্রামবাসীকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য বার্তা পাঠানো হয়। ৯ই এপ্রিল ভোরবেলা সাব-কমান্ডার এস এম আমীরের নির্দেশে আমরা ৫৩ জন মুক্তিযোদ্ধার ২টি দল দীপপুর গ্রামে অভিযানে যাই। গ্রামটিতে বাঁধের পূর্ব পাশে ইপিআর জনাব মো. শাজাহানের নেতৃত্বে আমরা ২০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল পাকিস্তানি ক্যাম্প দখলের জন্য একটি বড় বরই গাছের মাথায় এলএমজি সেট করে পজিশন নিই। একই সাথে বাঁধের পশ্চিম পাশে ইপিআর জনাব মো. আব্দুল আওয়ালের নেতৃত্বে ৩৩ জন মুক্তিযোদ্ধার অন্য দলটি পজিশন নেয়। বেলা দশটার সময় পাকহানাদার বাহিনী আমদের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি শুরু করে। আমরাও পাল্টা আক্রমণ করি । গুলি ও ব্রাশফায়ার করে তাদের পরাস্ত করার চেষ্টা করি। পাকবাহিনীর বেশ কয়েকজন নিহত হয়। বিকাল ৪.৩০ মিনিটে পাকবাহিনীর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তাদের অবস্থা জানার জন্য মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল খালেক তার সাথে আরও ২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ছোট একটি পুকুরের গা ঘেঁষে এগোতে থাকেন। হঠাৎ ৩ জনকে লক্ষ্য করে পাকহানাদার বাহিনী গুলি করলে তারা সবাই আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ২ জন উঠে পালালেও মো. আব্দুল খালেক পেটে গুলিবিদ্ধ হওয়ার কারণে উঠতে পারছিলেন না। তখন আমি ওপরের দিকে ফায়ার করতে করতে এগোতে থাকি। আমার বাম হাতের তালুতে একটি গুলি লেগে তালু ভেদ করে এবং ইপিআর মো. শাজাহান সাহেব আমার সাথে কাভার ফায়ারিং করেন। এই ফাঁকে অন্য মুক্তিযোদ্ধারা খালেককে গামছা দিয়ে পেট বেঁধে চর শালিকাপাড়া ক্যাম্পে নিয়ে আসে। অবস্থা বেগতিক দেখে পাকবাহিনী পিছু হটতে থাকে এবং নিজেরাই আহত পাকবাহিনীদের গুলি করে হত্যা করে।

কোনো কোনো আহত পাকসেনা নিজেই নিজের বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করে। অতঃপর জানতে পারলাম বাঁধের পশ্চিম পাশে মুক্তিযোদ্ধারা আহত হয়েছেন। আমিও আহত অবস্থায় গিয়ে দেখি মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ আর বেঁচে নেই। ইপিআর আব্দুল আওয়ালের ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হন এবং আমাদের ০৬ জন মুক্তিযোদ্ধা মারাত্মকভাবে আহত হন। আমরা সবাই আমজাদকে পাশের আফতাবনগরে কবরস্থ করি। শালিকাপাড়া ক্যাম্পে তিনদিন পর আঃ খালেকের অবস্থার অবনতি হলে আমরা তাকে নিয়ে গয়টা মির্জাপুর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নৌকা নিয়ে রওনা হই। নৌকায় ওঠার পরই খালেক আমার হাত ধরে বলে, 'বারী ভাই আমি তো মরে যাবো, তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বে।' কিছুক্ষণ পর নৌকাতেই তার মৃত্যু হয়। আমরা তাকে বেড়াবিবি হাই স্কুল মাঠে নিয়ে এসে স্কুল মাঠেই দাফন করি। আজও চোখ বন্ধ করলেই আমি শহিদ খালেকের চেহারা দেখতে পাই, মৃত্যুর আগে বলে যাওয়া তার কথাগুলো শুনতে পাই।

স্মৃতিকথন-১৪৮

সংস্থার নামঃ ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ মশিন্দা, গুরুদাসপুর, নাটোর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সাদেক প্রামাণিক

৭ই মার্চ, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর বুঝতে পারলাম দেশে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তখন আমার বয়স ছিলো ১৮ বছর। দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। ২৬শে মার্চ-এ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার পর আমি যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। তখন আমরা কয়েকজন যুবক কমান্ডার আব্দুল লতিফ মির্জার নিকট যাই। আমাদের আগ্রহ দেখে তিনি পলাশডাঙ্গা যুব শিবিরে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর কয়েকদিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা ৩০০ জন যুবক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিই। সেদিন ছিলো ১১ নভেম্বর ১৯৭১, বুধবার। আমরা রেডিও নিয়ে বসে দেশের অবস্থা সম্পর্কে শুনছিলাম। এমন সময় গুপ্তচর বাহিনী এসে খবর দেয় যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী

আমাদের নওগাঁয় আক্রমণ করবে। আমাদের কমান্ডার আব্দুল লতিফ মির্জার নির্দেশে আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। পাকবাহিনীর ওপর হামলা করার জন্য আমরা নওগাঁর দুটি পাড়ার নদীর মাঝখানে গিয়ে অবস্থান নিই। পাক হানাদার বাহিনী এসে নওগাঁর ২টি পাড়ায় নদীর দুই পাড়ে অবস্থান নেয়। তখনই আমরা নদীর মাঝখান থেকে গুলি ছুঁড়ি। এরপর সুযোগ বুঝে এক পর্যায়ে আমরা নদীর মাঝখান থেকে সরে পাড়ের দিকে চলে যাই। পাকিস্তানিরা কিছুক্ষণ বুঝতে না পেরে দুই পাড় থেকে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি চালাতে থাকে। অনেক পাকসেনা নিজেদের গুলিতেই মারা যায়। যখন তারা ভুল বুঝতে পারে তখন তাদের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এসময় আমরা আক্রমণ করলে তারা পালিয়ে যায়। আমরা নওগাঁকে স্বাধীন ঘোষণা করে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাই।

স্মৃতিকথন-১৪৯

সংস্থার নাম: সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ-বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: পানপট্টি, গলাচিপা, পটুয়াখালী

বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম মাহবুবুল আলম (দুধা)

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। তখন আমার বয়স ছিলো ১৮ বছর। আমরা গলাচিপা এলাকায় সংঘবদ্ধ হতে থাকি। দিনটি ঠিক মনে নেই; অক্টোবর মাসের কোনো একদিন আমরা সকাল ৭:০০টায় গলাচিপা থানা ঘেরাও করে পাকবাহিনীর ওপর হামলা করি। এসময় পাকবাহিনীও সংঘবদ্ধভাবে পাল্টা ফায়ারিং করতে থাকে। কিন্তু আমাদের কমান্ডার জনাব কে এম নূরুল হুদার পরিকল্পনায় এবং মুক্তিবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকবাহিনীর ৫ জন সেনা মারা যায়। এরই প্রেক্ষিতে, পাকবাহিনী ভীত হয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই গলাচিপা ছেড়ে পটুয়াখালী চলে যায়। আমাদের প্রস্তুতি বুঝতে পেরে তারা আর কখনও গলাচিপা এলাকায় আক্রমণের সাহস করেনি। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্য কিছুটা আহত হন।

স্মৃতিকথন-১৬০

সংস্থার নাম: শতফুল বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: গণিপুর, বাগমারা, রাজশাহী

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী আহমেদ

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমার বিয়ের ঠিক তিনদিন পরেই আমি মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই। একদিন মোহনপুর উপজেলার ধোরসা গ্রামে রাজাকারদের ওপর আক্রমণ চালাই। আমরা সেদিন ৫ জন রাজাকারকে ধরতে সক্ষম হই। ধোরসা বাজারের নদীর পাশে নিয়ে গিয়ে ৫ জনকেই গুলি করে শেষ করে দিয়েছিলাম। একই গ্রামে ছিলো আমার শ্বশুরবাড়ি। অপারেশন শেষ করে আমরা যখন এলাকা ত্যাগ করছিলাম ঠিক সেসময় আমি আমার স্ত্রীকে দেখতে পাই। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ করা এবং কথা বলা নিষেধ ছিলো। তাই আমি দলের সাথে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে নিরাপদে আমাদের আশ্রয়স্থলে চলে যাই। পুঠিয়া উপজেলার রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের বিড়ালদহ বাজার অংশে ইপিআর বাহিনী ও এলাকাবাসীসহ প্রায় ৫০০ জন মানুষ মিলে রাস্তায় গাছ ফেলে গর্ত করে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করি যাতে পাকসেনাদের গাড়িবহর রাজশাহীতে ঢুকতে না পারে। কিন্তু পাকসেনারা একইসাথে ২৫টি গাড়ি এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করেন। সেখানে অসংখ্য মানুষ শহিদ হন। আমি একটি পানির নালা দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে স্থান ত্যাগ করি। মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে ৩দিন পর্যন্ত না খেয়ে থেকেছি। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সম্মান পাচ্ছি। আমরা সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলবো।

স্মৃতিকথন-১৫১

সংস্থার নামঃ শতফুল বাংলাদেশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সংঘটিত পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধের বেশ কিছু ঘটনার মধ্যে অন্যতম একটি বর্ণনা করছি যা আজও আমাকে নাড়া দেয়। সেদিন ছিলো ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সাল, সময় আনুমানিক রাত ১১টা। আমরা খবর পেলাম, পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরবাড়ি থেকে রাজশাহীর উদ্দেশে তাদের সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে রওনা দিয়েছে। তাদের রাজশাহীমুখী অগ্রযাত্রা ঠেকাতে আমরা সেই রাত থেকে ইপিআর ও আনসার বাহিনীর সহায়তায় রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের বিড়ালদহে সড়ক অবরোধ করার পরিকল্পনা করি। সেই রাতেই আমরা রাস্তার পাশের বড় বড় গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করে দেই। পরদিন ১২ই এপ্রিল আনুমানিক দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে প্রথমেই ঝলমলিয়া বাজারে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরে তারা গুলি করতে করতে বিড়ালদহের কাছাকাছি আসলে বেলা ১টা ৩০ মিনিটের দিকে আমরা তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাই। এ সময় আমরা পাক হানাদার বাহিনীর ৫ থেকে ৬ জন জওয়ানকে গুলি করে মেরে ফেলতে সক্ষম হই। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তাদের ভারী অস্ত্রের মুখে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই। সেদিন আমার সহযোদ্ধা ইপিআর ও আনসার বাহিনীর বেশ কিছু ভাই শহিদ হন। এই ঘটনাটি প্রায়ই আমাকে আবেগাপ্লুত করে।

স্মৃতিকথন-১৫২

সংস্থার নামঃ নবলোক পরিষদ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ মূলঘর, ফকিরহাট, বাগেরহাট

বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম গোলাম ছরোয়ার

আমার যুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মনে পড়ে কপিলবুনিয়ার জমিদার বাড়িতে রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ করা। আমরা নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করি। রাজাকার বাহিনী শক্ত প্রতিরোধ

গড়ে তোলে। তিনদিন তিনরাত আমরা কমান্ডার আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে যুদ্ধ করি। কিন্তু রাজাকার বাহিনীকে আমরা পরাস্ত করতে পারিনি। কারণ আমাদের চেয়ে তাদের কাছে অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্র ছিলো। পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন আফজালের নেতৃত্বে বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে যোগ দেয়, ফলে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমরা প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণ করি। রাজাকার বাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহায়তায় ক্যাম্প থেকে পলায়ন করে। আমরা রাজাকার ক্যাম্প দখল করি। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। জয়নাল আবেদীনকে কোনো দিন ভুলতে পারিনি। কারণ যুদ্ধের সময় জয়নাল আবেদীন আর আমি পাশাপাশি ছিলাম। হঠাৎ একটি বুলেট তাকে আঘাত করে। আমার চোখের সামনে জয়নাল আবেদীন মারা যায়। আমরা তিনদিন অনাহারে ছিলাম, খুব কষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু ক্যাম্প দখল করার পর সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাই।

স্মৃতিকথন-১৫৩

সংস্থার নামঃ দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বারুইপাড়া, মিরপুর, কুষ্টিয়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার মোহাঃ ছানাউল্লাহ

ভারতের সিংভুম জেলার চারুলিয়া হতে গেরিলা যুদ্ধে ১ মাস ৫ দিন উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তার মধ্যে পোড়াদহ ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার সময় পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণের দৃশ্য আমার বেশি মনে পড়ে। কারণ ব্রিজ উড়ানোর সময় পাকবাহিনী আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। আমরাও তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে থাকি। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ গুলি বিনিময় হয়। আমরা সংখ্যায় ছিলাম ৬০ জন। তিন দিক থেকে আমরা একইসাথে গুলি করতে থাকি। পাকবাহিনী এক পর্যায়ে গুলিবর্ষণ বন্ধ করে পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমাদের কাছে সীমিত গোলাবারুদ থাকার কারণে প্রত্যেকেরই গুলি প্রায় শেষ হয়ে যায়। এ কারণে আমরা তাদের ধাওয়া না করে নিরাপদ অবস্থানে চলে আসি। ঐদিন

মিলিশিয়ারা পিছু না হটে আক্রমণ চালিয়ে গেলে আমাদের বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারতো। কারণ আমাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে গিয়েছিলো। আমাদের নির্দেশ ছিলো হিট এন্ড রান অর্থাৎ আঘাত করো এবং সরে পড়ো। সেদিনটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

স্মৃতিকথন-১৫৪

সংস্থার নাম: দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মালিহাদ, মিরপুর, কুষ্টিয়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গণি

যুদ্ধস্থল ও সময়: আমবাড়ীয়া, রাত ৮টা, ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর।

পরিকল্পনা সভা: পরিকল্পনা সভা গোপিনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমি গেরিলা কমান্ডার আব্দুল গণি এবং আমার বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মজিদ, আজিবার রহমান, আব্দুর রশিদ, আনছার আলী, জন্টু, গঞ্জের আলী, গোলাম রসুল, নওয়াব আলী, আব্দুল ওহাব, আশরাফ আলী, শেখ সোবান আলী, ওমর আলী, আহম্মদ আলী ও রাজ্জাক। সহকারী হিসাবে গঞ্জের আলী তোজাম্মেল এবং মুজিব বাহিনীর কমান্ডার মঈন উদ্দিনের বাহিনীর নুরুল ইসলাম, মহিউদ্দিন, হারেজ উদ্দিন, মণি দত্ত এবং সহযোগী গোলাম রহমান, খবির উদ্দিন, জালাল, রবিউল, মাবুদ উপস্থিত ছিলেন।

রাত ৯টা পর্যন্ত পরবর্তী যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। এই সভাতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জগন্নাথপুর গ্রাম সংলগ্ন রেলওয়ে ব্রিজের কাঠ পুড়িয়ে লাইন খুলে দিতে হবে। সেই মোতাবেক রাতের খাবার খেয়ে অগ্রসর হয়ে পাইকপাড়া স্কুল মাঠে উপস্থিত হই। এ কাজে এলাকার কয়েকজন খালাসীদের সাথে নেওয়া হলো। পাইকপাড়া গ্রামে মুদি দোকান থেকে এক টিন কেরোসিন নিয়ে আমরা গন্তব্যে অগ্রসর হলাম। খালাসীদের সাথে নিয়ে মঈন উদ্দিনের নেতৃত্বে কিছু মুক্তিযোদ্ধা রেল লাইন উপড়ে ফেলার দায়িত্ব পালন করে ও আমার গ্রুপে নূর ইসলাম, খবির উদ্দিন, নওয়াব আলীসহ বেশ কয়েকজন কেরোসিন দিয়ে আগুন লাগানোর দায়িত্ব

পালন করে। বৃষ্টির কারণে কাঠে আগুন লাগতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো। এতোকিছু করার পরও যখন পাকিস্তানি সেনাদের উপস্থিতি পাওয়া গেল না তখন মইনউদ্দিন তার বুলগেরিয়ান এলএমজি দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করলো। পরপর দুই ম্যাগাজিন গুলি শেষ করার পর মুক্তিযোদ্ধারা নিজ এলাকায় চলে যায়। আমি আমার বাহিনী নিয়ে গোপীনাথপুরে ফিরে আসি।

পরদিন ২২শে নভেম্বর সকাল হতে না হতেই সংবাদ পেলাম পাকিস্তানি বাহিনী হালসা বাজারে এসেছে এবং জ্বালাও পোড়াও করতে আমবাড়ীয়া আসবে। মুহূর্তে গোটা টিম প্রস্তুত হয়ে আমবাড়ীয়ার দিকে রওনা দিলাম। আমবাড়ীয়া উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম আব্দুল হান্নানের (গ্রাম হালসা) টিমের তাহেরসহ মকবুল হোসেনের টিমের সদস্য আক্কাস ও আরো অনেকে এবং আমবাড়ীয়ার লিয়াকত এবং সুতাইলের আজিজুল হক জোয়ার্দ্দারও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। গ্রাম পেছনে রেখে আমরা আমবাগানে পজিশন নিলাম। এ সময় পাকিস্তানি সেনা, আলবদর, রাজাকার হালসা বাজার হতে বামনগাড়ী হয়ে আমবাড়ীয়ার দিকে গুলি করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে। পাকিস্তানী সেনারা যখন আর একটু অগ্রসর হয়ে মাঠের মধ্যে তখন আমরা গুলি করি। উভয় পক্ষের গোলাগুলির বিকট আওয়াজে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। সুসজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনী যখন ভারী অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে আমাদের কাছে চলে আসে, তখন আমাদের গোটা টিম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। ঠিক সেসময় ভেদামরী গ্রামের দিক হতে গেরিলা কমান্ডার মকবুলের টিমের সদস্য শেখ কোরবান এবং মুজিব বাহিনীর ড. মসলেম উদ্দিনের গ্রুপের রাহাজ উদ্দিন, লিয়াকত আলী, আব্দুল বারী মাস্টারসহ আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা তাদের এল.এম.জি, এস.এল.আর ও ৩০৩ রাইফেল দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে কাভারেজ ফায়ার শুরু করে। অকস্মাৎ পিছন দিক থেকে এই আক্রমণে শত্রু বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং পূর্ব দিকে রেল লাইন অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। সেই সুযোগে আমি আমার সাথে থাকা সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রেলের বাগানের দিকে চলে যাই এবং সেখানে পজিশন গ্রহণ করি। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কোন সদস্য নিহত হয়নি। ঠিক সময়মত মকবুলের গেরিলা বাহিনী এবং মুজিব বাহিনীর লিয়াকত আলীসহ রাহাজের গ্রুপ প্রচণ্ড বেগে কভারেজ আক্রমণ না চালালে মুক্তিযোদ্ধাসহ অনেক সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলো।

স্মৃতিকথন-১৫৫

সংস্থার নামঃ গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ হরিরামপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খান বাহাদুর

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খান বাহাদুর, গ্রাম-মধ্যপাড়া, ডাকঘর-মধ্যপাড়া, ইউনিয়ন-১০নং হরিরামপুর, উপজেলা-পার্বতীপুর, জেলা-দিনাজপুর। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মা-বাবা বাধা দিলেও তাদের শত বাধা উপেক্ষা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চ ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকসেনাদের শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে গিয়ে ১৫ আগস্ট হতে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মালন ক্যাম্পে এক মাস যাবৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। তারপর ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় দিন পথিরাম ক্যাম্পে অবস্থান করি। ২১ সেপ্টেম্বর হতে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত মোট এক মাস শিলিগুড়ি পানিঘাটা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারের দুই দিন অর্থাৎ ২১ অক্টোবর তারিখ হতে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করি। তারপর বড়াহার ক্যাম্পে ২৩ অক্টোবর হতে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত দুই দিন অবস্থান করার পর যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করি। তারপর অস্ত্র নিয়ে সমজিয়া ক্যাম্পে ২৫ অক্টোবর হতে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১৮ দিন পাকসেনাদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করে হানাদারদের হাত থেকে অত্র এলাকা মুক্ত করি। এইভাবে পর্যায়ক্রমে বারাই বাজার, আমবাড়ী, রাজারামপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, কাঁচদহ ব্রিজ, হরনাথপুর, পীরগঞ্জ, পলাবাড়ী, গাইবান্ধায় প্রভৃতি এলাকায় যুদ্ধ করি। পরবর্তীকালে বগুড়ায় চার দিন অবস্থান করে ৪০০ জন মুক্তিসেনা একত্র হয়ে বগুড়ায় পাকসেনাদের গাড়ি বহরে আক্রমণ চালাই। এই যুদ্ধে প্রায় ২০০ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং ৭০ জন পাকসেনা আমাদের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। এর পরপরই জানতে পারি যে, সারা বাংলাদেশে পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। এ খবর শুনে আমরা বিজয় উল্লাস করি। ২০ ডিসেম্বর রংপুর ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসি।

স্মৃতিকথন-১৫৬

সংস্থার নাম: গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: জোতবানী, বিরামপুর, দিনাজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল আজিজ সরদার

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিলো ১৮ বছর। এমএনএ মোঃ ওফিল উদ্দিন মণ্ডল পতিরাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে শিলিগুড়ি পানিঘাটায় ২৮ দিন প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর যুদ্ধের জন্য বরাহা ক্যাম্পে আসি। সেখান থেকে হিলি কেটরা, জলপাইতলি ফকিরগঞ্জ, বোনতারা, আটপুকুরে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা, ৩ জন কমান্ডার, একজন সিও ও ২৫ জন ইন্ডিয়ান বি এস এফ জওয়ান মিলে সবাই একসাথে যুদ্ধ করি। কেটরায় সম্মুখ যুদ্ধে ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। তারা হলেন আব্দুর রহিম, তোফাজ্জল এবং সোচ্ছার।

সেই যুদ্ধে ৮ জন পাকসেনা মারা যায়। জলপাইতলিতে যুদ্ধকালীন আমার চোখের সামনে একজন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন পাকসেনার হাতে শহিদ হন। এই দৃশ্য মনে পড়লে আমি আজও শিউরে উঠি।

স্মৃতিকথন-১৫৭

সংস্থার নাম: প্রত্যাশী

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল লতিফ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি আর আমার কয়েকজন সহপাঠী মিলে চরণদ্বীপ চৌধুরী স্কুলে রাতের বেলা মিটিং করি এবং সেখানে ৯৯ জন সংগঠিত হয়ে রাতেই ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা দিই। দিনের বেলা বেতাগীর একটি মন্দিরে অবস্থান করি এবং রাতের বেলা ফটিকছড়ির পাহাড়ী পথে পায়ে হেঁটে আমরা ভারতে পৌঁছাই এবং ভারতে প্রায় একমাস অবস্থান করি। এরপর মেজর সোহানের নেতৃত্বে আমরা প্রশিক্ষণ নিই। টানা একমাস আমরা অস্ত্র চালনার ওপর প্রশিক্ষণ নিই। আমাদের সাথে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আইয়ুব খান এবং রফিক চেয়ারম্যান। প্রশিক্ষণের সময়সহ আমরা দীর্ঘ দুইমাস ভারতে অবস্থান করি।

যুদ্ধকালীন আমি মেজর রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ভারত থেকে এক মাসের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের ফটিকছড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। বাংলাদেশে আসার পর আমরা মুক্তিযোদ্ধারা মিলে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার চরণদ্বীপ ইউনিয়নের সেনবাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প স্থাপন করি এবং সেখান থেকে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করতে থাকি। আমরা মোট তিনজন কমান্ডার ছিলাম। আমি প্লাটুন কমান্ডার, কোম্পানি কমান্ডার বাশার ভাই ও থানা কমান্ডার সোলেমান ভাই। সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে বোয়ালখালী উপজেলার কালুরঘাট আক্রমণ, নাজিরের চর আক্রমণ (২ জন পাক সৈন্য মারা যায়), নাপিতের ঘাটা আক্রমণ, পূর্ব গুমদণ্ডী ১৩নং ব্রিজ আক্রমণ (এই অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ১২ জন ইপিআর সৈন্যও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল) এবং পশ্চিম গুমদণ্ডী অস্ত্র উদ্ধার অপারেশন সফলতার সাথে সম্পন্ন করি।

আমাদের বিভিন্ন অপারেশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপারেশন হলো সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে পাকবাহিনীর ঘাঁটি থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য কালুরঘাট ব্রিজ ধ্বংস করার চেষ্টা। কালুরঘাট ব্রিজ ধ্বংস করার জন্য ব্রিজের নিচে বিস্ফোরক বসাই কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেগুলো বিস্ফোরিত হয়নি। এর মধ্যে পাকবাহিনী ঘটনাটি বুঝতে পারলে আমাদের সাথে তাদের সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে আমাদের ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। তারা হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা বেবী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলু। ফজলু ভাই ছিলেন আমাদের ১২ জনের কমান্ডার। এরপর পশ্চিম গুমদণ্ডী অপারেশনে আমরা ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নিলাম এবং সেখানে রাজাকারের কমান্ডারসহ ৩২ জন আমাদের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধকলীন আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং দীর্ঘ ০৯ মাস যুদ্ধের পর আমরা পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ফল পেয়েছি স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে।

আমার কাছে ভাতা পাওয়াটা বড় কথা নয়, বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের যে সম্মান দিয়েছেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আজকে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বিশ্বের কাছে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি এটাই আমাদের বড়

পাওয়া। আমি আমাদের এই স্বাধীন দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করছি।

স্মৃতিকথন-১৬৮

সংস্থার নামঃ দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বারখাদা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মাহাতাব উদ্দিন

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুপ্রেরণা ছিলো আমার মা। তিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য। যুদ্ধ চলাকালীন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আমার মনে পড়ে কুষ্টিয়াকে শত্রুমুক্ত করার ঘটনা। কুষ্টিয়ার বারখাদাতে কুষ্টিয়াকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। তখন পাকিস্তানি বাহিনী তেজদাসকাঠী বধ্যভূমিতে ১৪ জন বাঙালিকে হত্যা করে যাদের একজন আমীর হোসেন। তার মাথায় পতাকার স্ট্যান্ড বসিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে হানাদাররা বাধ্য করছিলো, কিন্তু আমীর হোসেন জয়বাংলা ধ্বনি দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করেন। পাকবাহিনীকে প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রস্তুত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। এছাড়া সকল থানা বাজার এমনকি গ্রামে পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ১৯৭১ সালের ৩০ ও ৩১ মার্চ কুষ্টিয়া প্রতিরোধ যুদ্ধে পুলিশ ও ইপিআর-এর সাথে সহযোগী হিসেবে আমিও অংশগ্রহণ করি। এই যুদ্ধে প্রচুর পাকসেনা হতাহত হয়।

স্মৃতিকথন-১৬৯

সংস্থার নামঃ প্রত্যাশী

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ কালারমার ছড়া, মহেশখালী, কক্সবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আহামদ উল্লাহ

মুক্তিযুদ্ধকালীন আমার অনেক স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকে মহেশখালীতে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সংগ্রাম কমিটিতে আমরা একসাথে ৩০-৩৫ জন যোগদান করি। সংগ্রাম কমিটিতে

যোগদান করার সময় তৎকালীন প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা আমাদের সহযোগিতা করেন। পরে যুদ্ধ করার জন্য চট্টগ্রাম চলে যাই। চট্টগ্রাম চলে যাওয়ার পর পটিয়ার মিলিটারী পুল নামক জায়গায় পাকবাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। এরপর আমরা সাতকানিয়ায় চলে আসি। সাতকানিয়ায় আমরা এক নম্বর সেক্টরে যোগদান করি। ১৪ই ডিসেম্বর সকালে চট্টগ্রাম চন্দনাইশের দোহাজারী সাঙ্গু নদীর দুই পাড়ে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। সকাল হতে মুহুর্মুহু গুলি হচ্ছে। আমাদের সাথে ভারতীয় সেনারাও ছিল। পাকবাহিনী নদীর অপর প্রান্ত হতে এলোপাতাড়ি গুলি করছিলো। তখন আমাদের গ্রুপের কয়েকজনসহ আমি নদীর অপর প্রান্তে যাই এবং পাল্টা আক্রমণ করি। এক পর্যায়ে পাকবাহিনী পিছু হটে এবং সদলবলে পালিয়ে যায়। তাদের পালিয়ে যাওয়ায় আমরা আনন্দে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে থাকি।

স্মৃতিকথন-১৬০

সংস্থার নামঃ প্রত্যাশী

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ হাবিলাস দ্বীপ, পটিয়া, চট্টগ্রাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ ছফা

মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মেজর রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ভারত থেকে ২১ দিনের রাইফেল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বর্তমান বাংলাদেশের ফটিকছড়ি দিয়ে আমি ও আরো ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। বাংলাদেশে আসার পর থেকে আমরা বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে থ াকি এবং সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে রাঙ্গুনিয়া, বোয়ালখালী ও পটিয়ায় ছোট ছোট বিভিন্ন অপারেশন সফলতার সাথে সম্পন্ন করি। আমাদের বিভিন্ন অপারেশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে পাকবাহিনীর ঘাঁটি থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য কালুরঘাট ব্রিজ ধ্বংস করার চেষ্টা। আমরা ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা মিলে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত প্রধান বৈদ্যুতিক খুঁটিটি গ্রেনেড দিয়ে ধ্বংস করে পাকবাহিনীর ঘাঁটি থেকে বিদ্যুৎ

বিচ্ছিন্ন করে দেই। এরপর কালুরঘাট ব্রিজকে ধ্বংস করার জন্য কালুরঘাট ব্রিজের নিচে বিস্ফোরক স্থাপন করি। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেগুলো বিস্ফোরিত হয়নি। এর মধ্যে পাকবাহিনী ঘটনাটি বুঝতে পারলে আমাদের সাথে তাদের সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উক্ত যুদ্ধে আমাদের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

স্মৃতিকথন-১৬১

সংস্থার নাম: স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সিংহের বাংলা, সদর, নেত্রকোনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল জজ খান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক আয়োজিত ওয়েবিনারে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক ঘটনাই আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় একটি ঘটনা আমাকে আজও কষ্ট দেয় এবং আবার আনন্দিতও করে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ঘোষগাঁও বাজারে ঘটে যাওয়া ঘটনা এটি। এই বাজারে ১,৩০০ পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিলো। আমাদের ৩২ জন মুক্তিযোদ্ধার দায়িত্ব ছিলো এই ক্যাম্পের পাকিস্তানি বাহিনীকে হটানো। পাকিস্তানি বাহিনী যাতে বাইরে যেতে না পারে সে জন্য আমরা প্রতিনিয়ত রাস্তা ঘাটের ব্রিজ ভেঙে দিতাম। একদিন রেকির মাধ্যমে হঠাৎ খবর পেলাম বাগবীর গ্রামের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কয়েকজন হিন্দু যুবতীকে ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে এবং একজন মেয়ে ক্যাম্পে ধর্ষিত অবস্থায় আছে। আমরা সকলে মিলে ক্যাম্পের চারিদিক ঘেরাও করে পাকিস্তানি বাহিনীকে হটিয়ে মেয়েদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা নিয়ে অস্ত্র চালানো শুরু করলাম। দুইদিন পর ওদের হটিয়ে ধর্ষিত মেয়েটিকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করি। মেয়েটির ক্ষত বিক্ষত চেহারাটি আমার চোখের সামনে আজও মাঝে মধ্যে ভেসে উঠে। ভাল লাগে এই ভেবে যে আমরা ওদের হটিয়ে দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু আবার এটা

ভাবলেই খারাপ লাগে যে দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে এভাবে ইজ্জত বিসর্জন দিতে হয়েছে।

স্মৃতিকথন-১৬২

সংস্থার নাম: পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: ওমরপুর, চরফ্যাশন, ভোলা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাসান আলী

আমি ১৯৪৯ সালের ১৩ আগস্ট দ্বীপ জেলা ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার বৃহত্তর আছলামপুর ইউনিয়নের আলীগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতার নাম মৃত ওসমান আলী এবং মাতার নাম মৃত আছিয়া খাতুন। আমি ভাই বোনদের মধ্যে তৃতীয়। পড়ালেখা বেশি দূর করতে পারিনি। মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি। শৈশব থেকে চঞ্চল ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে ঢাকা চলে যাই। ঢাকা ৭ দিন অবস্থান করে ৭ই মার্চে ঐতিহাসিক জনসভায় অংশগ্রহণ করে ইতিহাসের এক জ্বলন্ত সাক্ষী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি এবং বঙ্গবন্ধুর সেই জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেই। তারপর আমি কিছু দিন ঢাকা অবস্থান করে গ্রামের বাড়ি চলে আসি। এরপর বাড়ির ভাইবোন আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১২ই এপ্রিল চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে চলে যাই। ১৭ই এপ্রিল চট্টগ্রামের নিউ মার্কেট এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে প্রথমে আক্রমণের শিকার হই। এই আক্রমণের ফলে রাগে ক্ষোভে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে আরো সংকল্পবদ্ধ হই। তিনজন মুসলমান এবং তিনজন হিন্দু যুবক নিয়ে মোট ছয়জনের একটি দল গঠন করি। এই দল ১৮ এপ্রিল সকাল বেলা ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে সাবরুম থানায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের ১নং সেক্টরের অধীন হরিণা ইয়ুথ ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার জন্য রওয়ানা দেয়। সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর অশেষ রহমতে কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হই। এই সাতদিন খেয়ে না খেয়ে নির্ঘুম রাত অতিবাহিত

করেছি। সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান আমার সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রশিক্ষণার্থী FF ১০৬০২ নং সদস্য হিসেবে ভর্তি করান। বর্তমানে সদস্য নং ৪৭৩৮৯। ২ মাস ২৭ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর সাবরুম বাজারের পশ্চিম পাশে মনু ঘাট ডিফেন্স ক্যাম্প এ চলে যাই। সেই ক্যাম্প থেকে যুদ্ধ করি। বিভিন্ন স্থানে হানাদার বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে সাফল্য লাভ করি। হরিণা, আন্ধার মানিক, করেরহাট ও পানছড়ি ইত্যাদি স্থানে পরিচালিত অপারেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করি। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর হরিণা হেড কোয়ার্টারে চলে আসি। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ছাগলনাইয়া দিয়ে ১নং সেক্টরে প্রবেশ করি। ছাগলনাইয়া করিয়ার দীঘির পাড়ে হানাদার বাহিনীর সাথে আবারো মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেখান থেকে হানাদার বাহিনী পালিয়ে যায়। ওই স্থান থেকে শুভপুর ব্রিজের কাছে এসে ব্রিজ ভাঙ্গা পাওয়া যায়। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় নদী পার হয়ে কুমিরা ঘাট-ঘর এলাকায় অবস্থান করে সেখানে শেষ যুদ্ধ করে ৪১ জন রাজাকার আলবদর ও আলশামস্‌কে হত্যা করি। ১৯৭১ সাল ১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা খবর পাই জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ১নং সেক্টর চট্টগ্রাম কলেজে অবস্থান গ্রহণ করে। পরিশেষে স্বাধীন বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সবার কণ্ঠে একটি আওয়াজ জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

স্মৃতিকথন-১৬৩

সংস্থার নামঃ মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ বাঙালিপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইসমাইল হোসেন

আমি ১৯৫৩ সালের ২৬ই মার্চ পাকিস্তান আর্মিতে সৈনিক হিসেবে যোগদান করি। সৈনিক হিসেবে পাকিস্তান আর্মিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য আমি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাই এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই আমার কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই আমি কর্মরত ছিলাম। এরপর ১৯৭০ সালে পশ্চিম

পাকিস্তানের মুলতানে পোস্টিং হয়। মুলতানে কাজে যোগদানের পূর্বে আমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আমার জন্মভূমি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মাসের ছুটিতে চলে আসি। নিজ জন্মভূমি নোয়াখালীতে এসেই দেখতে পাই দেশে চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা। এরকম উত্তেজনার মধ্যে ৪ মাস ছুটি শেষে মুলতানে কাজে যোগদান করি। মুলতানে কাজে যোগদানের পরপরই ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হয়। নোয়াখালী, সন্দ্বীপ, হাতিয়া এবং ভোলার উপকূলীয় অঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটে। আমার বাড়ি নোয়াখালী হওয়ায় আমাদের পরিবারও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি আবারও ২ মাসের ছুটিতে বাড়ি আসি। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে আমার ছুটি শেষ হলে আমি ঢাকা ট্রানজিট ক্যাম্পে যোগদান করি। ক্যান্টনমেন্টে তখন টানটান উত্তেজনা। সেখানে একজন মেজরের ভাষণ শুনে আমরা উজ্জীবিত হই এবং ট্রান্জিট ক্যাম্প থেকে গোপনে বের হয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে এক ভাইয়ের বাসায় আত্মগোপন করে অপেক্ষা করি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শোনার জন্য। ৭ই মার্চে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সশরীরে উপস্থিত হই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য ৯ তারিখ রাতের ট্রেনে ঢাকা থেকে নোয়াখালী ফিরে আসি।

১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ তারিখ হতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে সব যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আমি বাড়ি পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি এবং আমার সহপাঠি ছাত্রনেতা ছিদ্দিকুর রহমান ও সিরাজুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করি। ছাত্রনেতারা তখন থেকেই ছাত্র, যুবক, আর্মি, ইপিআর ও আনসার সদস্যদের সংগঠিত করতে থাকে। এর মধ্যেই ২৫ই মার্চের সেই ভয়াল কালরাত্রি আসে। পাকিস্তান আর্মির নৃশংসতায় গোটা বিশ্ব কেঁপে উঠে। এই রাতে শহিদ হন হাজার হাজার মানুষ। মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে ২৫ই মার্চের ভয়াবহতার কথা। এই সময়েই শুনতে পাই ২৬ই মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা। এমনই পরিস্থিতিতে পরিবারের কাউকে না জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য নৌকাযোগে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম বর্ডার দিয়ে ভারতের ত্রিপুরায় চোতাখোলা ক্যাম্পে পৌঁছাই। সেখানে পূর্ব-পাকিস্তানের

ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর সদস্য, আনসার সদস্য এবং ছাত্র যুবকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় মুক্তিফৌজ ইউনিট। এরপর বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর হয়ে অবশেষে ৯ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে যুক্ত হই এবং আলফা কোম্পানিতে সৈনিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধে অনেকগুলি সম্মুখ সমরে লড়াই করি। এর মধ্যে সালদার যুদ্ধ, নাসিম গড়ের যুদ্ধ, কসবার যুদ্ধ এবং সবশেষে কসবার লাতুমুড়ার যুদ্ধ অন্যতম। কসবার লাতুমুড়ার রণাঙ্গনে মরণপণ লড়াই করে পকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি লাতুমুড়া মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয়। লাতুমুড়ার যুদ্ধে কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট আব্দুল আজিজসহ আমার অনেক সহযোদ্ধা শহিদ হন। এই যুদ্ধে আহত হয়ে আমি প্রাণে বেঁচে যাই। আমার হাতের অস্ত্রটি ছিলো এসএমজি। আমি অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করছি এমন সময়ে হঠাৎ ব্রাশ ফায়ারের একটি বুলেট এসে আমার ডান হাতের কবজিতে বিদ্ধ হয়। এতে আমার হাতের তিনটি আঙ্গুল প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আহত হওয়ায় আমাকে পিছনে পাঠানো হয়। ভারতের ত্রিপুরায় বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিয়ে অবশেষে ভারতের লক্ষ্ণৌতে সামরিক হাসপাতালে আমার হাতের অপারেশন করে আঙ্গুল জোড়া লাগানো হয়। লক্ষ্ণৌতে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে যখন দেশে ফিরে আসি তখন মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে উড়ছে লাল সবুজের পতাকা। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে আমি ৯ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করি। আমাকে আমার নিজ কোর ইএমইতে সংযুক্ত করা হয়। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, আমার চিকিৎসার যাবতীয় নথিপত্র ভারতে থাকায় পরবর্তীকালে আমি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারিনি। ফলে যুদ্ধাহত সৈনিকের গেজেটে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারনে আমি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার কোন প্রকার সুবিধা প্রাপ্ত হইনি। স্বাধীন বাংলাদেশে সৈনিক হিসেবে চাকুরি করে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে অবশেষে ১৯৯২ সালে অবসর গ্রহণ করি। মরণপণ লড়াই করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পেরে আমি গর্বিত।

স্মৃতিকথন-১৬৪

সংস্থার নামঃ পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ মিঠামইন ইউনিয়ন, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা কুটিল চন্দ্র দাস

প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমরা মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ গণ-প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমার সাথে ছিলেন আমার গ্রামের সহযোদ্ধা বিজন চন্দ্র দাস। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সে টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে একদিন শয্যাশায়ী থাকার কারণে তার দুপুরের খাবার আনার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। আমি তার খাবার আনতে ক্যাম্পের খাবারের ঘরে যাই। সেখানে খাবার বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন একজন শিখ সৈন্য, যাকে দেখলে খুবই ভয় হতো এবং সে ছিলো অত্যন্ত বদমেজাজী। আমি ভয়ে ভয়ে তার কাছে খাবার চাইলাম। কিন্তু সে হিন্দিতে কি যে বললো আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর নিরুপায় হয়ে পেটে হাত দিয়ে দেখিয়ে বারবার ইংরেজিতে বললাম "গিভ মি সাম রাইস"। তখন সে রাগান্বিত স্বরে হিন্দিতে যা বলল তার বাংলা করলে দাঁড়ায় - 'দূর হয়ে যা বেতমিজ, তোরা বাঙালি শুধু খেতে জানিস, পেটুক জাতি। তোদের দিয়ে যুদ্ধ করা হবে না।' তখন আমি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চলে আসি এবং বন্ধুকে বলি তোর জন্য খাবার আনতে পারিনি। তখন বন্ধু বললো, আমার জন্য তুই এতো কষ্ট করেছিস যে, তা কখনও ভুলবার নয় ।

স্মৃতিকথন-১৬৫

সংস্থার নামঃ সামাজিক সেবা সংগঠন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ সহদেবপুর, কালিহাতী, টাঙ্গাইল

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাবিবুর রহমান

আমি মোঃ হাবিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে দেশমাতৃকাকে রক্ষার তাগিদে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ১১নং সেক্টরের অধীনে সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহেরের নেতৃত্বে ভারত হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একই সেক্টরে বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধকালীন অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা আমার মনে

গভীরভাবে রেখাপাত করে। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া থানার কাশিগঞ্জ বাজারে অবস্থানকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে আমাদের দেখা হয়ে যায়। আমরা সেখানে সংখ্যায় ছিলাম ১০০ জন। অপরদিকে পাকিস্তানি শত্রুদের সাথে ছিলো তাদের এ-দেশীয় দোসর রাজাকার বাহিনী। সেখানে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় এবং সেই গোলাগুলিতে আমাদের সহযোদ্ধাদের মধ্য হতে ০৭ জন শাহাদাত বরণ করেন। আমার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এই একটি মর্মান্তিক ঘটনা আমাকে আজও কাঁদায়।

স্মৃতিকথন-১৬৬

সংস্থার নাম: সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: সাতৈর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা নিখিল চন্দ্র দাস

যশোর জেলার আড়পাড়া গ্রামে যুদ্ধের সময় অবস্থানকালে এলাকার একসময়ের বিখ্যাত ডাকাত ও রাজাকার কোটন ডাকাতের উৎপাতে আমাদের বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা হয়রানির শিকার হয় ও পাকবাহিনীর কাছে ধরা পড়ে। এ অবস্থায় একদিন আমরা একটি পরিকল্পনা করে তার বাড়ি আক্রমণ করি। আক্রমণের এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। কিন্তু আমাদের আক্রমণের তীব্রতার মুখে দলটি সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং শেষমেশ তারা ঐ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। এর কিছুদিন পর আরেকটি অপারেশনের একটি বিশদ পরিকল্পনা করি। যশোর জেলার আড়পাড়া গ্রামে আমাদের সেক্টরের ৮ জনসহ প্রায় তিন শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে প্রথমে আখক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে এবং পরে পাকসেনাদের ক্যাম্প ঘেরাওসহ সারারাত তাদের সাথে যুদ্ধ করি। আমাদের কমান্ডার ছিলেন মোঃ হেমায়েত হোসেন এবং এই যুদ্ধের প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দেন মোঃ তৌসীফুর রহমান (ল্যান্স নায়েক)। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করার সময় একটি বুলেটের খাপ এসে আমার পায়ে লাগে এবং আমি আহত হই। এ সময় আমাদের মধ্য থেকে ০৪ জন শহিদ হন। ০৪ জন শহিদ হওয়ার পরও আমরা জয়ী হই। আমাদের আক্রমণের প্রেক্ষিতে ভোর হবার আগেই ওরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে আমারা সকলে মিলে আমাদের শহিদদের কবরের ব্যবস্থা করি।

স্মৃতিকথন-১৬৭

সংস্থার নাম: অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: হবখালী, নড়াইল সদর, নড়াইল

বীর মুক্তিযোদ্ধা নুর মোহাম্মদ মল্লিক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ১৯৭১ সালে আমি পুলুম গোলাম ছরোয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। ২৮ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে আমি নহাটা আঞ্চলিক মুক্তিফৌজ ক্যাম্পে যোগদান করি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকার বাহিনী আমার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তারপর বনগ্রামে লে. মতিয়ার সাহেবের ক্যাম্পে ভর্তি হই। সেখানে একমাস প্রাইমারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে জুনিয়র প্রশিক্ষণের জন্য আমাকে পুনরায় বারাকপুর আর এম মুখার্জীর ক্যাম্পে পাঠানো হয়। সেখানে একমাস প্রশিক্ষণের পর আবার বিহারের বীরভূমে একমাস প্রশিক্ষণ হয়। বিহারের বীরভূমে প্রশিক্ষণ সিরিয়াল ৪৫২ এবং ঈ-২০২। ০৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে নহাটা মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প কমান্ডারের নির্দেশক্রমে ভারত হতে আমি অস্ত্রবিহীন ফেরত আসি। ফায়ারিং প্র্যাকটিস করানো ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে একটি দলভুক্ত করে আমাকে গ্রুপ কমান্ডার করা হয়। আমাকে একটি খ-৩৩৪০ রাইফেল ও ৫০ রাউন্ড গুলি দেওয়া হয়। ৩৫টি গ্রামে নিয়মিত টহল ডিউটি করি এবং লিফলেট বিতরণ করি। কিছুদিন পরপর স্থান ত্যাগ করি। আমাদের সাথের ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি খান সেনাদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। বুকের রক্ত নিজ হাতের আঙ্গুলে মেখে ধূলার ওপরে লিখেছিলেন "জয় হোক বঙ্গভূমির"। লেখা শেষ না হতেই আমার সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন একজন। সেই ঘটনা আজও স্মৃতিতে ভাসে। ঘুমঘোরে দুঃস্বপ্নে মাঝে মাঝে জেগে উঠি। বেদনার আর্তনাদ আমাকে ভীষণভাবে কষ্ট দেয়। ২৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সালে নড়াইলের রূপগঞ্জ মিলিশিয়া ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিয়ে Arms Discharge Certificate গ্রহণ করি।

স্মৃতিকথন-১৬৮

সংস্থার নাম: অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: নবাবপুর, সোনাগাজী, ফেনী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার কবির আহাম্মদ

মহান মুক্তিযুদ্ধে নবাবপুর ভোরবাজারের যুদ্ধ প্রায় ৫ ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিলো। সেই রণাঙ্গনে পাক আর্মি সুবেদার মেজর গুল মোহাম্মদসহ ১৪-১৫ জন নিহত হয়। ঐ যুদ্ধে আমি সশরীরে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করি।

এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধকালীন এক পর্যায়ে ভোরবাজার রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকারেরা ভোরবাজার ঘেরাও করে আমাকে গ্রেফতার করে এবং ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে। কমান্ডার আবু ইউসুফ ও হোসেনের নেতৃত্বে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে আমাকে উদ্ধার করে এবং রাজাকারেরা ভোরবাজার ক্যাম্প থেকে পালিয়ে মহদিয়া ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। পরের দিন সকালবেলা রাজাকারেরা মজুপুর আক্রমণ করলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পুনরায় সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সমগ্র ইউনিয়নসহ আশেপাশের ইউনিয়নও রণাঙ্গনে পরিণত হয়। পাকহানাদার বাহিনী ও বাংলার দোসর রাজাকার-আলবদরদের সাথে আমাদের বারবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, তাদেরকে হটিয়ে আমরা আমাদের অঞ্চলকে পরিপূর্ণভাবে দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হই।

স্মৃতিকথন-১৬৯

সংস্থার নাম: দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বিলাসবাড়ী, বদলগাছী, নওগাঁ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সামাদ মীর

আমি মোঃ আবদুস সামাদ মীর, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৭নং সেক্টরে, সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের অধীনে যুদ্ধ করি। মুক্তিযুদ্ধে ঘটে

যাওয়া অগণিত ঘটনাসমূহের মধ্যে ভারতের বাঙালিপুরের মেহেদীপুর থেকে প্রশিক্ষণ নেয়ার এক মাস পরের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের পর একটি বাড়িতে আমরা ১৭ জন আশ্রয় নেই। বাড়িওয়ালা আমাদের আশ্রয় দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে খবর দেয়। খবর পেয়ে হানাদার বাহিনী চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে ফেলে। পাকিস্তানি বাহিনীর অ্যাম্বুশের বৃষ্টির মতন গুলির মধ্যেও আমরা পাল্টা জবাব দেই এবং কোনোরকমে ১১ জন নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। এই অ্যাম্বুশে আমাদের ৬ জন সহযোদ্ধা ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন। আর বাকি ১১ জনের মধ্যে ৪ জন মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হন। পরবর্তীকালে এই ৪ জনও শাহাদাত বরণ করেন। এই ঘটনা মনে পড়লে সহযোদ্ধাদের কথা ভেবে এখনো চোখ ভিজে যায়। অনেক সহযোদ্ধাসহ অগণিত প্রাণ আমরা মুক্তিযুদ্ধে হারিয়েছি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একটাই চাওয়া--ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ।

স্মৃতিকথন-১৭০

সংস্থার নামঃ মুক্তি কক্সবাজার

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ চৌফলদণ্ডী, সদর, কক্সবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরা মিয়া

দিনটি ছিলো বৃহস্পতিবার, ২৫ই নভেম্বর, ১৯৭১। আমরা তখন কক্সবাজার জেলার বর্তমান রামু উপজেলার ঈদগাহ ইউনিয়ন হতে ৫ মাইল পূর্বে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের (বর্তমান বান্দরবান জেলা) লামা উপজেলার নতুন মুরং পাড়ায় অবস্থান করছিলাম, আর শত্রুদের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে তাদের হামলা করার ছক কষছিলাম। কিন্তু তার পূর্বেই পাকহানাদাররা দালাল রাজাকারদের সহায়তায় আমাদের অবস্থানের খবর পেয়ে সকাল আনুমানিক ৮ টার দিকে অতর্কিতভাবে আমাদের ওপর হামলা চালায়। পাহাড় বেষ্টিত অঞ্চলে আমাদের ছিলো না পিছু হটার কোনো পথ কিংবা প্রতিরোধ করার মত ভারী কোনো অস্ত্র। এমতাবস্থায়, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কমান্ডার হাবিলদার আব্দুছ ছোবহানের নির্দেশে সকলের দৃঢ় মনোবল ও প্রত্যয়ে আমরা আমাদের হাতে

যা কিছু আছে তা দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাই। কমান্ডারের পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা বারবার আমাদের অবস্থান ও কৌশল পরিবর্তন করে যুদ্ধ করতে থাকি। আমাদের এরকম আক্রমণে পাকসেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা কোনরূপ সুবিধা করতে না পেরে পার্বত্য আদিবাসী মুরংদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। প্রায় ৩ ঘণ্টাব্যাপী চলমান এই যুদ্ধে শত্রু পক্ষের ৮ জন নিহত ও ৯ জন আহত হয়। ইতোমধ্যে মুরং পাড়ার পার্শ্ববর্তী আরেকটি মুক্তিযোদ্ধার দল আমাদের সাথে যুক্ত হয়। তারা যুক্ত হওয়ায় আমাদের দল শক্তিশালী হয় আর আমাদের চতুর্দিকের আক্রমণে মুখে পাকসেনারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ সময় আমরা শত্রুপক্ষের জি-থ্রিসহ ৭টি রাইফেল ও ৪টি সিভিল গান উদ্ধার করি। এই যুদ্ধে সফলতার পেছনে রয়েছে কমান্ডারের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত, সকলের দৃঢ় মনোবল ও প্রত্যয়। মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে আমার এই ঘটনাটি খুব বেশি মনে পড়ে।

স্মৃতিকথন-১৭১

সংস্থার নাম: সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: পাঁচগাছি, পীরগঞ্জ, রংপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী সুভাষ চন্দ্র চৌধুরী

আমি সুভাষ চন্দ্র চৌধুরী, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার পাঁচগাছি ইউনিয়নের বাসিন্দা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকাকে রক্ষার তাগিদে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মুক্তিযুদ্ধে ১১নং সেক্টরে, সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহের এবং আমার কোম্পানি কমান্ডার সাহাদাত হোসেনের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করি। মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটে যাওয়া অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে বিজয়ের কাছাকাছি সময়ে গাইবান্ধার কামারজানিতে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধের স্মৃতি আমার হৃদয়পটে এখনো জ্বলজ্বলে শিখার মতন জ্বলছে। পাকবাহিনী এই সময়ে মূলত মনোবল হারিয়ে অনেকটা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলো। আমরা তাদের ঘাঁটি আক্রমণ করি। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনী পাল্টা হামলা করে জবাব দেয়। আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে শেষ পর্যন্ত তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আমার সহযোদ্ধাদের মধ্যে আনোয়ার বুকে গুলি লেগে শহিদ হন।

স্মৃতিকথন-১৭২

সংস্থার নাম: সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বানিয়াজুরী, ঘিওর, মানিকগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জাবেদ আলী খাঁন

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আমার বারবার মনে পড়ে। মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শিবালয় থানাধীন চালিতাবাড়ী গ্রামে ১০ অক্টোবর, ১৯৭১ সালে ২০-২৫ জন পাকিস্তানি সেনা আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এর বিপরীতে আমরা ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা মিলে গ্রেনেড ও রাইফেল দিয়ে প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। এই সম্মুখযুদ্ধে আমরা ০৪ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করি এবং বাকি সেনারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। উক্ত রণাঙ্গনে আমার দুই জন বন্ধু ঢাকাইজোড়া গ্রামের ধীরেণ শীল ও দিয়াইল গ্রামের লোকমান দরবেশ শহিদ হন। আমরা বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকি। যুদ্ধ করতে করতে সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনি। ১৬ ডিসেম্বর সাকরাইল স্কুলে আমাদের ক্যাম্পে বিজয় পতাকা উত্তোলন করি। এরপর আমরা এরিয়া সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরির নির্দেশে আলফা কোম্পানির কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মহিউদ্দিন-এর নেতৃত্বে অত্র এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হই। আলফা কোম্পানির সকল মুক্তিযোদ্ধা মানিকগঞ্জ পিটিআই ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিয়ে জানুয়ারি মাসে আমি বাড়ি ফিরে আসি।

স্মৃতিকথন-১৭৩

সংস্থার নাম: এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অফ কমিউনিটি হেল্‌থ এ্যাডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মাইজবাড়ী, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ

বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী জিয়াউল হক

আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রথমে ভারতের বালুঘাটে যাই।

সেখানে ভর্তি হতে না পেরে পরবর্তীকালে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ দিয়ে ভারতে যাই। সেখানে গেলে কামরুজ্জামান সাহেব প্রথমে আমাকে রেশন কার্ড করে দেন। দিনের বেলা ভারতে আর রাতের বেলা বাংলাদেশের মসজিদে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতাম। কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরে আসি। ৩ দিন বাড়িতে থেকে চাঁদা তুলে ২৬ জন মিলে একটি নৌকা ভাড়া করে গেলাম রৌমারীতে। কারণ রৌমারীতে তখন ১১০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ দিচ্ছিলেন কর্ণেল ওসমানী সাহেব। আমি ৫৩নং ব্যক্তি হিসাবে নিয়োগ পাই। আমাকে লালমনিরহাট জেলার মগলহাটে এসে থাকতে হতো। একবার আমরা লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার রেলব্রিজ ভাঙ্গার অপারেশনে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিলো আর কোনো পাকিস্তানি সৈন্য যেন হাতিবান্ধায় ঢুকতে না পারে। চার গ্রুপে ৮০ জন সৈন্য মিলে আমরা আশ্রয় নিলাম একটি খালের মধ্যে। তখন আমাদের কাছে মাত্র ২০০টি গুলি ছিলো, কাটআপ পার্টিতে ২০ জন করে সৈন্য ছিলো। কিন্তু আমাদের কোন কাভারিং পার্টি ছিলো না। আমরা খালের ভিতর থেকে মাত্র ৫ রাউন্ড গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবীরা ব্যাপক পাল্টা গুলি ছুঁড়তে থাকে। এক পর্যায়ে দিনের বেলা আমাদের কয়েকজন সৈন্য তাদের অবস্থান জানার জন্য একটি ব্যারাকের কাছে যায়। হঠাৎ পাঞ্জাবিরা বুঝতে পারে, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সৈন্যরা গ্রেনেড ছুঁড়ে তাদের কিছু সৈন্যকে হত্যা করে। তারাও পাল্টা হামলা করে আমাদের ৬ জন যোদ্ধাকে হত্যা করে। তারপরও আমরা সামনে এগিয়ে গিয়ে বিস্ফোরকের সাহায্যে রেলব্রিজ গুঁড়িয়ে দিয়ে রেললাইন উপড়ে ফেলতে সক্ষম হই। ফলে নতুন করে আর কোন পাকিস্তানি সৈন্য হাতিবান্ধায় ঢুকতে পারেনি। পুরো অপারেশন গেরিলা পদ্ধতিতে হলেও সম্মুখযুদ্ধও করতে হয়েছে আমাদের।

স্মৃতিকথন-১৭৪

সংস্থার নাম: গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: গঙ্গাপুর, বোরহানউদ্দিন, ভোলা

বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ আঃ করিম

সারাদেশের মত ভোলায়ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যখন চারদিকে পাকবাহিনী

ও রাজাকারদের পরাজয় হতে থাকে সে সময়ই চিহ্নিত ও সংঘবদ্ধ রাজাকারদের ১৭ জনের একটি দল মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে বাধ্য হয়ে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে বোরহানউদ্দিন উপজেলাধীন দেউলা ইউনিয়নে স্থানীয় প্রভাবশালী চৌধুরী বাড়িতে অস্ত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। রাজাকারদের আত্মসমর্পণের এই সংবাদ ভোলা সদরে অবস্থানকারী পাকবাহিনীর কাছে পৌঁছে যায়। এরই প্রতিশোধ হিসেবে ১৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ভোলা থেকে পাকবাহিনী দেউলা এসে ইউনিয়নের চৌধুরী বাড়ি ও তালুকদার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং সাধারণ মানুষকে হত্যার জন্য দেউলা এলাকায় অভিযান চালায়। পথিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা এই খবর পায় এবং পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জনাব সিদ্দিকুর রহমান, হাবিলদার হযরত আলী মিয়া, অবঃ সুবেদার আমির হোসেন মিয়া, সেনা সদস্য আসমত আলীসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করে। এ যুদ্ধে ২৮ জন পাকিস্তানি সৈন্য গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং আরো ১২ জন আহত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ অক্টোবর ১৯৭১ দৌলতখান উপজেলার বাংলা বাজারের উত্তরে কাঠের ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে রাস্তার পাশে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান জেনে পাকবাহিনী নৌ-পথে এসে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই পেছন থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ করে এবং সমগ্র বাংলাবাজারের দোকানসহ সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি-সংযোগ করে। সে সময় কিছু মুক্তিযোদ্ধা স্থান ত্যাগ করতে পারলেও যুদ্ধস্থলে ৬৬ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায় ও অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়।

স্মৃতিকথন-১৭৫

সংস্থার নামঃ মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ ইসবপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আছির উদ্দীন

মুক্তিযুদ্ধকালীন হামজাপুর এলাকায় দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় কানদেবপুর চকের দীঘি ক্যাম্পে গোলাবারুদ পৌঁছানোর সময় ৩/৪ মাইল যাওয়ার পর

হঠাৎ করে পাকিস্তানিদের বোমা বর্ষণ শুরু হয়। এমন সময় বিকট শব্দের কারণে ৮/১০ জন মুক্তিসেনা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং আমি নিজেও অজ্ঞান হয়ে পড়ি। প্রায় আধা ঘণ্টা পর দেখতে পেলাম সবাই জীবিত আছে। এরপরে গোলাবারুদ নিয়ে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছাই। ফিরে আসার সময় দেখলাম যে, যেসব জায়গায় বোমা পড়েছে সেসব জায়গায় দীঘির মত গর্ত হয়ে আছে। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ১৭ই ডিসেম্বর আমার সহযোগীদের মধ্যে ৯ জন ও ভারতীয় সৈনিকসহ ভারতীয় সাজোয়া যানে চড়ে গোটা শহরে ঘুরে বেড়াবো বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমি তাদের নিষেধ করি এই বলে যে, আপনারা এখন বাইরে যাবেন না কারণ শহরের বিভিন্ন জায়গায় শত্রু পক্ষ ল্যান্ডমাইন পেতে রেখেছে। কিন্তু তারা সে কথায় কান না দিয়ে শহরে ঘুরতে বের হয়। রওনা হওয়ার আধাঘণ্টা পর মাইন বিস্ফোরিত হয়ে গাড়ি বিধস্ত হয়। ভারতীয় সৈনিকসহ ০৭ জন ঘটনাস্থলেই মারা যায়; তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং আমার ০২ জন ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা মোঃ আমিনুল হক এবং মোঃ আব্দুল আজিজ অগ্নিদগ্ধ হয়ে ফিরে আসেন। অগ্নিদগ্ধ দুই জনের মধ্যে একজন উন্নত চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান এবং অন্যজন হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান। এই দুইজনকে নিয়ে এসে হামজাপুর ক্যাম্পে দাফন করা হয়। হামজাপুর ক্যাম্পে দাফন সম্পন্ন করে ফিরে আসার পথে মোহনপুর বর্ডারে খান সেনাদের ক্যাম্পে বাংলাদেশী ৪/৫ জন যুবতী নারীকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা যায়। সে স্মৃতি এখনও মনে হলে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে।

স্মৃতিকথন-১৭৬

সংস্থার নাম: জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: কোলা, বদলগাছী, নওগাঁ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

আমি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার কোলা ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের অগ্নিঝরা ভাষণে সাড়া দিয়ে দেশমাতৃকাকে রক্ষার তাগিদে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে

পড়ি। মুক্তিযুদ্ধের ৭নং সেক্টরে, সেক্টর কমান্ডার মেজর কাজী নুরুজ্জামান এবং সাবসেক্টর কমান্ডার বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের অধীনে যুদ্ধ করি। গৌরবাগানের বর্ডার পেরিয়ে প্রথমে ভোলাহাট শিবগঞ্জ হয়ে মেহেদীপুর দিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঢোকার পথে পাকসেনাদের সাথে সম্মুখ-সমরে ১৪ই ডিসেম্বর আনুমানিক বেলা ১০ টায় আমার কমান্ডার ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর পাকিস্তানি শত্রুর গুলি কপালে লেগে শহিদ হন। পরে তাকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সোনামসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। তরুণ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের অসীম সাহস আর অকপট আত্মত্যাগের কথা মনে করে আজও গর্ববোধ করি এবং অনুপ্রাণিত বোধ করি। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

স্মৃতিকথন-১৭৭

সংস্থার নামঃ পাবনা প্রতিশ্রুতি

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ দোগাছি, পাবনা সদর, পাবনা

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইশারত আলী জিন্নাহ

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার জলাঙ্গি থানার পদ্মা নদীর ঘাট থেকে আমরা ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে ছোট একটি নৌকায় করে রওনা হই। তারপর পদ্মার মাঝে বাজুমারা নামক স্থানে এসে উপস্থিত হই। ইতোমধ্যে তিন চারটি অপরিচিত নৌকা অস্ত্রসহ আমাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে আমরা রাজাকার না মুক্তিযোদ্ধা এটি জানতে চায়। তার বলেন, আপনারা সত্য করে বললে কোনো কিছু হবে না। আল্লাহর নাম ভরসা করে আমরা বলি আমরা মুক্তিযোদ্ধা। তখন তারা সপক্ষে প্রমাণ চান। কলকাতা থাকাকালীন বাংলাদেশ 'মুক্তিযোদ্ধা সহায়ক সমিতি' নামক প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করা পরিচয়পত্র তাদেরকে দেখাই। এরপর তাঁরা আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা চান এবং আমাদেরকে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারার বায়টা ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই আমরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হই। এ সময় তারা লঞ্চের মধ্যে অবস্থান করছিলো। তাদেরকে দেখামাত্র আমরা নৌকা পাড়ে ভিড়িয়ে উঁচু জায়গায় আত্মগোপন করি এবং লঞ্চ লক্ষ্য করে কয়েকটি

গ্রেনেড নিক্ষেপ করি এবং এসএমজি দ্বারা ব্রাশ ফায়ার করি। গ্রেনেডের আঘাতে লঞ্চটি পানিতে ডুবে যায় এবং ৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় ।

স্মৃতিকথন-১৭৮

সংস্থার নাম: সেলফ হেলপ এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর, নীলফামারী

বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল হক সরকার

মুক্তিযুদ্ধকালীন দেওয়ানগঞ্জ বাজার থেকে চিলাহাটি কেতকিবাড়ি যাওয়ার পথে পাকসেনাদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আমাদের ৩ জন সহযোদ্ধা শহিদ হন এবং শত্রু পক্ষের আনুমানিক ৩০ জনের মতো মারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের সহযোদ্ধাদের লাশ আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। সেদিন আমিও আল্লাহর রহমতে অল্পের জন্য বেঁচে যাই। তারপর আমাদের ব্যাটালিয়ন আমার দায়িত্বে হলদিবাড়ি রেললাইনের পাশে একরামুল হক পীর সাহেবের মাজারের পশ্চিম পার্শ্বে এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়িতে অবস্থান নেয়। আমরা জানতে পারলাম যে, ভাউলাগঞ্জ বাজারে খানসেনাদের ডিফেন্স আছে যেখান থেকে তারা হলদিবাড়ি বর্ডারে বিএসএফ ক্যাম্পে হামলা করে তাদের ক্যাম্প ভেঙে দেয় এবং কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া, তারা গ্রামের কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। এই সংবাদ পেয়ে আমি আমার দলবল নিয়ে সেখানে আক্রমণ করি এবং তাদের ক্যাম্পকে তছনছ করে দেই। এতে কয়েকজন খানসেনা মারা যায়। পরের দিন আবার আমরা রেললাইন দিয়ে বর্ডার ক্রস করে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। সেদিন আমরা দেখি এক বাড়িতে কয়েকজন লোক চাদর গায়ে দিয়ে (রাজাকার) সেই বাড়ির আশেপাশে আনাগোনা করছে। আমি আমার সহকর্মীকে নিয়ে রেল গেটের পাশে লাইট মেশিনগান দিয়ে ফায়ার করলে তারা আমাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং শোরগোল শুরু করে। আমি তাকিয়ে দেখি একজন খানসেনা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আবার আমরা বর্ডার ক্রস করে হলদিবাড়ীতে প্রবেশ করি।

স্মৃতিকথন-১৭৯

সংস্থার নাম: মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: শশরা, সদর, দিনাজপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ কফিল উদ্দিন

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঠাকুরগাঁও মহকুমা থেকে ইপিআর আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে ঠাকুরগাঁও সেক্টরে নিয়ে আসে। একটি রাইফেল দিয়ে তারা আমাকে আমার টিমের সাথে দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলায় পাঠায়। সেখানে ঝাড়বাড়ি গ্রামের নদীর ধারে ডিফেন্স নিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে যায়। এর মধ্যে সৈয়দপুর থেকে পাকসেনারা ভারী অস্ত্র নিয়ে ঠাকুরগাঁও জেলার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের কাছে তেমন কোন ভারী অস্ত্র ছিলো না বিধায় পিছু হটার জন্য নির্দেশ দিলে আমি পীরগঞ্জ চলে আসি। আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের খবর পেয়ে পাকসেনারা আমার স্ত্রীকে ইউনিয়ন পরিষদে ধরে নিয়ে যায়। পরে আমার বাবার অনুরোধে তাকে ছেড়ে দেয়। সে সময় সংখ্যালঘু হিন্দুরা দলে দলে ভারত অভিমুখে চলে গেলে বিভিন্ন জায়গায় তারা নির্যাতনের স্বীকার হতে থাকে। নিরাপদে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি তাদের গাইড হিসেবে কাজ করি। এর কিছুদিন পর ভারতের মালন বিএসএফ ক্যাম্পে যোগদান করি। সেখানে অস্ত্র পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আর মাঝে মাঝে এলাকায় এসে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করতে থাকি। ভারতীয় অফিসারের নেতৃত্বে আমরা অপারেশন শুরু করি। এর কিছু দিন পর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর আমাদের দলে অংশগ্রহণ করেন। তারই নেতৃত্বে আমরা অপারেশন চালাই। একদিন অপারেশন চলাকালে দুই ইঞ্চি মর্টারের কিছু অংশ আমার আর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের গায়ে লাগলে আমরা আহত হই। অসংখ্য ঘটনার মাঝে একদিন ধুকুরঝাড়ী নামক স্থানে সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেখানে আমাদের দুই সহযোদ্ধা গুলির আঘাতে শহিদ হন। এরপর পীরগঞ্জ গোগর চৌরাস্তায় মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাকসেনাদের গাড়ি উড়িয়ে দেই। পরে জানতে পারি আমাদের পরিবার থেকে আমার চাচা ও চাচাতো ভাইকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে গিয়ে খুনিয়া দীঘি নামক স্থানে গুলি করে হত্যা করেছে। আর আমাদের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের শেখানো বুলি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" জপতে জপতে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করি।

স্মৃতিকথন-১৮০

সংস্থার নাম: ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: লক্ষণপুর, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম

১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন আমি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে সুবেদার পদে কর্মরত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিলে ঢাকা জেলার ২ নম্বর সেক্টরে স্বাধীনতার লক্ষ্যে সাব-সেক্টর কমান্ডার আবুল বাসার এর নেতৃত্বে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। একটি ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। যুদ্ধে যাওয়ার আগ দিয়ে আমি আমার শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নিতে আসি। এসময় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। অনেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করে। আমি তাদেরকে কোনো রকম বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর অনেক যোদ্ধাকে হারিয়ে দেশকে স্বাধীন করে ব্যারাকে ফিরে আসি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের বিমান বাহিনীতে যোগদান করি। ১৯৯৪ সালে চাকরি থেকে অবসরে যাই।

স্মৃতিকথন-১৮১

সংস্থার নাম: ইকো–সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: তুষভাণ্ডার, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট

বীর মুক্তিযোদ্ধ মোঃ সৈয়দ আলী

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার পাটেশ্বরীতে আমাদের বাংকার ছিলো। হঠাৎ

সকালবেলা দেখি, পাটেশ্বরীতে পাক-হানাদার বাহিনী অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। জবাবে আমরাও পাল্টা হামলা চালাই। কিন্তু তাদের সাথে পেরে উঠতে না পারার কারণে পিছু হটি এবং ভুরুঙ্গামারি বাংকারে অবস্থান নিই। একজন মুক্তিযোদ্ধা ভাই আমাদের সংবাদ দেয় যে পাক সেনাবাহিনী এদিকের ধরলা নদী পার হতে পারেনি। তখন আমরা পুনরায় গোলাবারুদ নিয়ে সবরকম প্রস্তুতি সেরে ট্রাকে করে রওনা দিই। যাত্রাপথে ভূরুঙ্গামারী এবং পাটেশ্বরীর মাঝামাঝি একটি জায়গা টিগলীতে আমরা পাকবাহিনীর ভয়াবহ অ্যামবুশের মধ্যে পড়ি। তারা প্রথমে ট্রাকের চাকায় গুলি করে ট্রাক থামিয়ে দেয় এবং মেশিনগান থেকে বৃষ্টির মতন গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমাদের ট্রাকটি নদীর কিনারা ঘেঁষে একটি রাস্তা দিয়ে চলছিলো। আমাদের ৩৩ জনের মুক্তিযোদ্ধা দল থেকে শুধুমাত্র আমি কোনোরকমে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বেঁচে যাই। আমার বাকি সকল সহযোদ্ধা (৩২ জন) এই ভয়াবহ আক্রমণে শহিদ হন।

স্মৃতিকথন-১৮২

সংস্থার নাম: পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: দাসের বাজার, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা ছালেহ আহমদ

ঘটনাটি ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগের। আলিনগর চা বাগান এলাকায় পাকবাহিনীর একটি শক্ত ঘাঁটি ছিলো। এখান থেকেই ১৯৭১ এর অক্টোবর পর্যন্ত তারা বিভিন্ন জায়গায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকবাহিনীর প্রায় ২৫০ জন প্রশিক্ষিত সশস্ত্র সদস্য ছিল। আমরা আমাদের সাবসেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াকিউজ্জামান-এর নির্দেশে মাত্র ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা আলিনগরে অবস্থান করে যুদ্ধ শুরু করি। তাদের লোকবল সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব ধারণা ছিলো না। যুদ্ধে প্রথম ৩দিনে আমাদের ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। পরে লেফটেন্যান্ট ওয়াকিউজ্জামান-এর নির্দেশে আমরা কৌশল পরিবর্তন করি। আরো ৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে যুক্ত হলে আমরা সরাসরি অতর্কিত হামলা করি এবং টানা ২ দিন ২ রাত যুদ্ধ করি। এতে করে পাক বাহিনির প্রায় ২৫-৩০ জন সদস্য মারা যায়। ওদের

প্রায় ২০০ জনের মতো একটি দল আত্মসমর্পণ করে এবং পুরো ঘাঁটিটি আমাদের দখলে চলে আসে। ওদের কিছু সদস্য চা বাগানের পেছন দিয়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের বিষয়ে পরবর্তীকালে জানা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, পুরো ৯ মাসে মৌলভীবাজারে মুক্তিযুদ্ধকালীন এতো স্বল্প সময়ে পাকবাহিনীর কোন ঘাঁটি দখল নেয়া সম্ভব হয়নি যা মৌলভীবাজারের ইতিহাস বইতে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

স্মৃতিকথন-১৮৩

সংস্থার নাম: রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: মরিচপুরাণ, নালিতাবাড়ী, শেরপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জামাল উদ্দিন

আমি মোঃ জামাল উদ্দিন মহান মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহেরের নেতৃত্বে ৯নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অগণিত ঘটনার মধ্যে একটি এখানে তুলে ধরছি। মুক্তিযুদ্ধকালীন শেরপুর থেকে পাকবাহিনীর নালিতাবাড়ী অভিমুখী অগ্রযাত্রা রোধ করতে শেরপুর ও নালিতাবাড়ী সংযোগ সড়কের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত কাটখালি ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে রাতের অন্ধকারে আমরা ১০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাকবাহিনী আমাদের অবস্থান টের পেয়ে গেলে তাদের সাথে আমরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হই এবং আমাদের দলীয় কমান্ডার নাজমুল এই যুদ্ধে শহিদ হন। শহিদ নাজমুলের নামে নালিতাবাড়ীতে 'সরকারি নাজমুল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, স্বাধীনতার অনেক পরে সেই কাটাখালী ব্রিজের পাশে 'নাজমুল স্মৃতিসৌধ' স্থাপন করা হয়।

স্মৃতিকথন-১৮৪

সংস্থার নাম: বাস্তব-ইনিসিয়েটিভ ফর পিপল্‌স সেলফ ডেভেলপমেন্ট

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: শীলখালী, পেকুয়া, কক্সবাজার

বীর মুক্তিযোদ্ধা ছাবের আহমদ

আমি ছাবের আহমদ, বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ পেকুয়া উপজেলা শাখার কমান্ডার। ১৯৭১ সালে আমি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার গহিরা কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম এবং কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) সক্রিয় সদস্য ছিলাম। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী হই। ১০ই মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চকরিয়া থানা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চ চকরিয়া থানা সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তে চকরিয়া হাইস্কুল মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হলে আমি প্রশিক্ষণে যোগদান করি। এই প্রশিক্ষণে আরো প্রায় দুই শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষক ছিলেন- নায়েক (অব:) বদিউল আলম, কর্পোরাল মোজাম্মেল হক, শহিদ হাবিলদার আবুল কালাম, হাবিলদার গোলাম কাদের, সিপাহী নজির আহমদ এবং সার্জেন্ট জমির উদ্দিন। প্রশিক্ষণের একপর্যায়ে রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে চকরিয়া থানা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তে ২০ই মার্চ চকরিয়া এলাকায় অপারেশন করে রাইফেল সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই অপারেশনে কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয় নায়েক (অবঃ) বদিউল আলমকে। ২০ মার্চ রাত আনুমানিক ১০টার দিকে পাকহানাদার বাহিনীর দখলে থাকা থানায় অপারেশন করে ১২টি রাইফেল ও বুলেট সংগ্রহ করি। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করলে চকরিয়া থানা সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আবার চকরিয়া থানা অপারেশন করে রাইফেল ও গুলি সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

২৬শে মার্চ সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে নায়েক বদিউল আলম, নজির আহমদ ও কর্পোরাল মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে আমরা ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা চকরিয়া থানায় অপারেশন করে ১৮টি রাইফেল ও অনেক বুলেট সংগ্রহ করি। ২৯শে মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত নায়েক বদিউল আলমের নেতৃত্বে আমরা ৪০ জনের একটি দল ঐতিহাসিক কালুরঘাট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এই যুদ্ধে আমার সহযোদ্ধা ছিলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট কামাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমির হামজা, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইউসুফ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অজিত কুমার নাথ। এই যুদ্ধে আমাদের সহযোদ্ধা আকবর আহম্মদ শহিদ হন। এছাড়া ৯ মাস বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী, রাউজান, গহিরা, ফটিকছড়ি ও কক্সবাজারে সংগঠিত বিভিন্ন যুদ্ধে ও গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার স্মৃতি আজও মানসপটে ভেসে উঠে। তারপরও শেষ পর্যন্ত দেশকে শত্রুমুক্ত করে আমরা যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি এটাই বড় স্বস্তি।

স্মৃতিকথন-১৮৫

সংস্থার নামঃ জাকস ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নঃ আয়মা রসুলপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মণ্ডল

আমি তখন এস.এস.সি. পাশ করে ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তখনই ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মরহুম মীর শহিদ মন্ডল, আজিজার চৌধুরী, ডাঃ আব্দুল কাদের ও মোঃ সাইদার রহমান প্রমুখদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাঁচবিবি লাল বিহারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কমিটিতে নাম লিপিবদ্ধ করি। প্রথমে পাঁচবিবি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা পাহারা দেয়ার দায়িত্ব পাই। ইতোমধ্যে পাকবাহিনী সারা বাংলায় তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে বিভিন্ন এলাকায় ঘরবাড়ি জ্বালাতে শুরু করেছে। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকে। পাক হানাদার বাহিনী আমার গ্রামের বাড়ি মালিদহ হাজীপাড়া পুড়িয়ে

দেয় এবং আমার বড় ভাই আবুল কালাম, প্রতিবেশী লোকমান হোসেন এবং আব্দুস সামাদকে পাঁচবিবি আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। মীর শহিদ এর নেতৃত্বে আমরা ৬ জন শিয়ালা বর্ডার দিয়ে ভারতের বালুরঘাটে চলে যাই। সেখান থেকে যাই মালদহের মহদিপুর। জলপাইগুড়ির পাঙ্গায় এবং আসামের হাবলং-এ একচল্লিশ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে অস্ত্র হাতে শিয়ালা বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। বাংলাদেশে প্রবেশ করে জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করি এবং যুদ্ধে সফল হতে না পেরে আমরা আবারও ভারতের শিয়ালা ক্যাম্পে ফিরে যাই এবং সেখান থেকে মাঝে মাঝে বাংলাদেশে প্রবেশ করে যুদ্ধ করতে থাকি। পাকবাহিনী আমাদের অবস্থান জানতে পেরে শিয়ালা ক্যাম্প আক্রমণ করে এবং ক্যাম্প জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হই। তার কিছুদিন পর কোমরপুর জহির উদ্দিন মণ্ডলের বড় পুকুর পাড়ে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের আরও একটি সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে পাকবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসারসহ কয়েকজন সৈন্য মারা যায় এবং তাদের মনোবল ভেঙে যায়। এরপর ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমরা পাকবাহিনীর পাগল দেওয়ান ক্যাম্প আক্রমণ করি এবং আক্রমণের তীব্রতায় পাকবাহিনীর প্রায় ১৬ জন সৈন্য তাদের ব্যবহৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং খাদ্যসামগ্রী ফেলে পালিয়ে যায়। আমরা ক্যাম্প দখল করে অস্ত্র, গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধা অফিসে জমা দেই। উদ্ধারকৃত পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী স্থানীয় লোকজনের মাঝে বিতরণ করা হয়। জয়পুরহাট পাগল দেওয়ান ছিলো পাকবাহিনীর নির্যাতনের এবং হত্যাকাণ্ডের অন্যতম ভয়ঙ্কর স্থান। পাগল দেওয়ানের এই সম্মুখ যুদ্ধ ছিলো আমার শেষ এবং অন্যতম সেরা যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরপরই শুনতে পাই পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে এবং বাংলাদেশ বিজয়ী হয়েছে।

স্মৃতিকথন-১৮৬

সংস্থার নাম: সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন: রতনপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল কাশেম

মুক্তিযুদ্ধকালীন ২নং সেক্টরের, সেক্টর হেডকোয়ার্টারে সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের অধীনে কর্নেল (অবঃ) মোঃ শওকত আলী-এর নেতৃত্বে চার্লি কোম্পানিতে ২১ দিনের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ৩নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার সেজামারার অধীনে ২৮ এমএফ কোম্পানির সম্মুখ যুদ্ধের একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ৩নং সেক্টরের অধীনে আখাউড়া হতে তেলিপাড়া পর্যন্ত বর্ডার সীমানায় অনুষ্ঠিত সকল সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সর্বশেষ ১৭ ও ১৮ নভেম্বর ১৯৭১ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার পাহাড়পুর ইউনিয়নের অধীনে মুকুন্দপুর রেলস্টেশন সিগনাল সংলগ্ন সেজামুরা গ্রামের পাক সেনা ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। পাকবাহিনীর ক্যাম্প দখল, ৫০ জন পাক সেনাসদস্যের মধ্যে অধিকাংশের মৃত্যুবরণ এবং আহত ও জীবিত অবস্থায় অনেকের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। আমাদের মধ্যে কেউ হতাহত হয়নি।

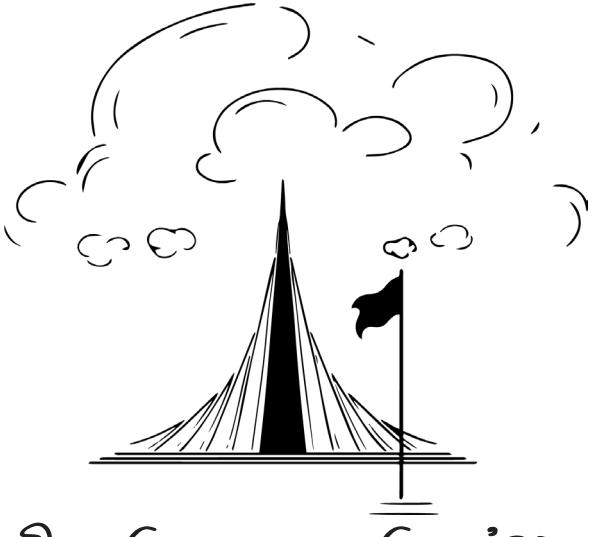

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে '৭১

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮০-২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org
ফেসবুক: www.facebook.com/pksf.org

978-984-35-1884-2